দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ২০ সংখ্যা।। ১২ জানুয়ারি, ২০২৬।। ২৭ পৌষ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

বাংলাদেশে লাগামছাড়া জেহাদি সন্ত্রাস

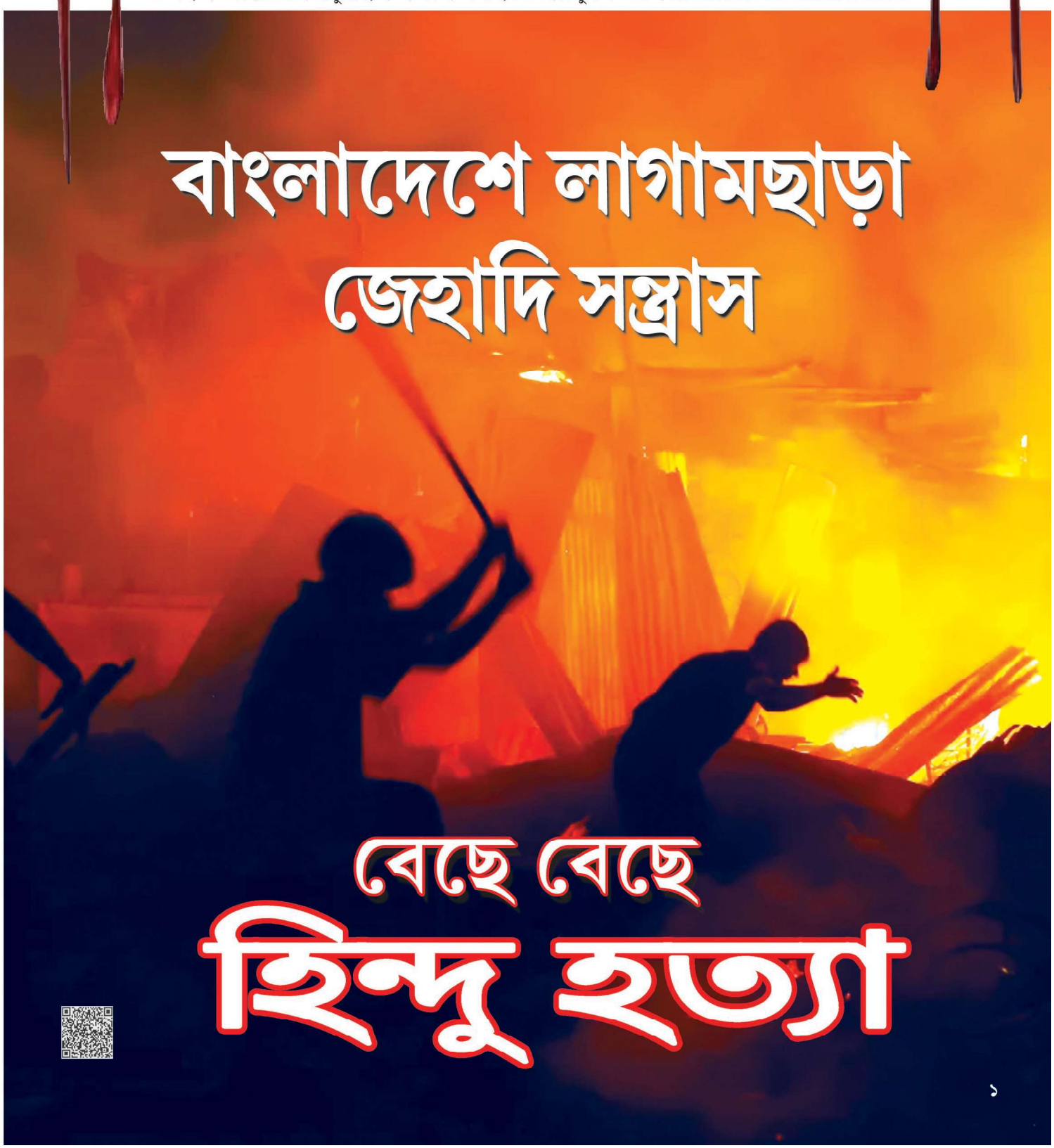

বেছে বেছে হিন্দু হত্যা

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ২৭ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১২ জানুয়ারি - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

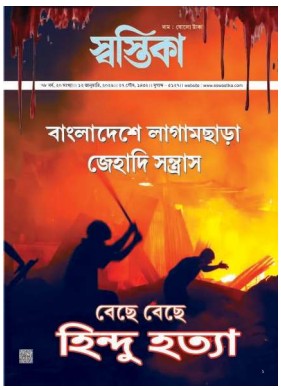

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

কেউ না চাইলেও ২০২৬-এর ভোটে মানুষ পরিবর্তন আনবেই : জালিয়াতরা খেলছে জুয়া □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

রুমাল যখন বেড়াল হয় □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

সঙ্ঘ, সমাজ ও রাজনীতি □ অধ্যাপক সঞ্জয় দ্বিবেদী □ ৮

পশ্চিমবঙ্গ কি আদৌ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার? □ কৌটিল্য □ ১০

দীপুচন্দ্র দাস থেকে বাবরের ছায়া : চরমপন্থী মানসিকতার বিরুদ্ধে ভারতের বিবেকের লড়াই □ সাধন কুমার পাল □ ১১

জেহাদিদের হাত থেকে সনাতনীদের বাঁচান! ভারত সরকারের কাছে আকুল আবেদন বাংলাদেশি শরণার্থীর □ ১৩

বাংলাদেশে হিন্দু নিধন কি ঘুম ভাঙাবে এদেশের হিন্দুদের? □ দিগন্ত চক্রবর্তী □ ১৫

'বাংলাকে গুজরাট হতে দেব না' : চাইলেও গুজরাট হতে পারবেন কি? □ সোমনাথ গোস্বামী □ ১৭

শাসকদল আড়াল করলেও অনুপ্রবেশকারী দখলমুক্ত হবেই পশ্চিমবঙ্গ □ প্রদীপ মারিক □ ২০

শতবর্ষে বিধ্বস্ত ছায়ানট : বঙ্গ সংস্কৃতির ছায়াহীন আজ বাংলাদেশ □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ২৩

হারানো পত্রিকা : এক নতুনের দিশারি 'প্রবাসী' □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

মকর সংক্রান্তি উৎসব ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তা □ পিন্টু সান্যাল □ ৩৪

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে □ আনন্দ মোহন দাস □ ৩৭

বাংলাদেশে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ সত্যিই অন্ধকার □ সুভাষ চক্রবর্তী □ ৩৯

বিশ্বমানবতার সুরসাধক : ভূপেন হাজারিকা— এক কিংবদন্তী □ মিঠুন রায় □ ৪৩

পাকিস্তানের পরাজয়ের চিহ্ন মুছে ফেলতে নিরলস কাজ করছেন ড. ইউনুস □ ৪৫

ঘনীভূত ভারতের প্রতিমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ □ রবিব্রত ঘোষ □ ৪৮

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

□ চিঠিপত্র : ১৯ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ

সমাচার : ২৭-৩০ □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □

প্রকাশিত হবে ১৯ জানুয়ারি ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৯ জানুয়ারি ২০২৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক আপোশহীন সৈনিক, যিনি এই লক্ষ্যের জন্য জীবনের সর্বস্ব অর্পণ করেন, তাঁর জন্য ব্রিটিশশক্তি ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয় ও ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করে— তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় নেতাজীর জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করবেন কয়েকজন নেতাজী গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০্) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মধ্যযুগীয় বর্বরতা

পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের কপালে দুর্ভাগ্যের ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল দরবেশ শাহ জালালের আগমনের অব্যবহিত পরেই। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বেশ কয়েকজন অনুচর লইয়া ইসলামের প্রচারের জন্য শ্রীহট্টে আসিয়াছিল এই দরবেশ। তার মূল কাজ ছিল জোর করিয়া অথবা প্রলোভিত করিয়া হিন্দুদিগকে ধর্মান্তরিত করিয়া ইসলামের অনুগামী করা। এই কাজে সফল হইয়া সে নব্য মুসলমানদের সহায়তায় শ্রীহট্টের নরপতি গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করিয়া বঙ্গভূমিতে মুসলমান শাসনের পথ প্রশস্ত করে। বাদশা, নবাব ও স্থানীয় শাসকদের মদতে ধারাবাহিক ধর্মান্তরণে পূর্ববঙ্গ একসময় মুসলমান সংখ্যাধিক্য হইয়া পড়ে। ফলস্বরূপ অবশিষ্ট হিন্দুসমাজের ধর্মীয়, সামাজিক-সহ সর্বপ্রকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগের পূর্ব হইতে শুরু করিয়া স্বাধীন ভারতেও দফায় দফায় হিন্দুদিগের উপর নামিয়া আসিয়াছে নানাবিধ অত্যাচার। যেকোনো অজুহাতে সেখানকার হিন্দুদের উপর আক্রমণ সংঘটিত হইয়া থাকে। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালি, ১৯৫০ হইতে ৬০ দেশভাগজনিত, ১৯৬৪ সালে হজরতবাল, ১৯৯০-৯২ সালে ভারতে শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির আন্দোলন প্রভৃতি অজুহাতে হিন্দুদের উপর আক্রমণ নামিয়া আসে। ইহা ব্যতীত প্রতিবৎসর দুর্গাপূজার সময় ইসলাম অবমাননার অজুহাতে আক্রমণ তো রহিয়াছেই। পূর্ব পাকিস্তানের কবল হইতে স্বাধীন হইয়া বাংলাদেশ হইবার পর হিন্দুরা ভাবিয়াছিলেন বোধ হয় তাহাদের দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটিল। কিন্তু মুসলমানদের জেহাদি মানসিকতার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হইল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দুদিগেরই আত্মত্যাগ সর্বাধিক ছিল, সেই মর্যাদাটুকুও তাহারা পায় নাই। বরং তাহাদের উপর আক্রমণের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অত্যাচারের মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে ২০২৪ সালে জুলাই মাসে জেহাদি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর হইতে। জেহাদি ছাত্র-জনতা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে বিতাড়িত করিয়া, পাকিস্তানের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া হিন্দুদিগের উপর অত্যাচারের মাত্রা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। একটি তথ্যে প্রকাশিত যে, ২০২৪ হইতে অদ্যাবধি হিন্দুদিগের উপর তিন হাজারের অধিক অত্যাচারের ঘটনা ঘটিয়াছে। জেহাদি জনতার দখলদারি সরকারের মদতেই তাহা ঘটিতেছে। এতদিন বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম এইসব ঘটনার উপর আলোকপাত করে নাই। পশ্চিমবঙ্গের সেকুলার ও তথাকথিত প্রগতিশীল সংবাদমাধ্যমও তাহা আড়াল করিয়া সম্প্রীতির গান গাহিয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে বাংলাদেশের জেহাদি ছাত্রনেতা ওসমান হাদির মৃত্যুতে তথাকার জেহাদি জনতা নূতন করিয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় মাতিয়াছে। দীপুচন্দ্র দাস নামে এক হিন্দুকে গাছে ঝুলাইয়া অগ্নিদগ্ধ করিয়াছে, খোকনচন্দ্র দাস নামে এক যুবককে পেট্রোল ঢালিয়া দগ্ধ করিয়াছে, এক কিশোরী কন্যাকে বলাৎকার করিয়া হত্যা করিয়াছে। ইতিমধ্যে তাহারা ওই দেশে বাঙ্গালিয়ানার শেষ চিহ্ন ছায়ানট, উদীচী অগ্নিদগ্ধ করিয়াছে। তাহার সহিত তিনটি সংবাদমাধ্যমের কার্যালয়েও হামলা চালাইয়াছে। এককথায়, বাংলাদেশ এখন মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তালিবানি শাসনকেও ম্লান করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে হিন্দুদের অবস্থাও কিন্তু বাংলাদেশেরই অনুরূপ। পূর্বতন বাম শাসন এবং বর্তমান শাসক দল তথা সরকারের সীমাহীন তোষণনীতির কারণে এই রাজ্যেও জেহাদি মুসলমানদের বাড়বাড়ন্ত ঘটিয়াছে। তাহাদের অসহিষ্ণুতায় বহু জেলায় হিন্দুদের ঘর পুড়িয়াছে, হিন্দু নারীর সম্ভ্রমহানি ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মালদহ-মুর্শিদাবাদে জেহাদি আক্রমণে বাস্তুচ্যুত হইয়া হিন্দুদিগকে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সবই ঘটিয়াছে অথবা ঘটিতেছে রাজ্য শাসকদলের নেতাদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ মদতেই। তাহাতে রাজ্য প্রশাসন একেবারে নিশ্চুপ। এই রাজ্যে হিন্দুরা যেন দুয়োরানি, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত জেহাদিদের খুশি করিতে হিন্দুধর্মকে গালি দিয়া থাকেন। এই রাজ্যের বৃহদংশ মুসলমান ভারত আক্রমণকারী বাবরের প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাই তাহারা বাবরের নামে মসজিদ নির্মাণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। বাংলাদেশের ন্যায় এই রাজ্যেরও হিন্দু সমাজ আতঙ্কের মধ্যে দিনযাপন করিতেছে। রাজ্য সরকার তথা প্রশাসনের ন্যায় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যমও মৌনতা অবলম্বন করিয়া নীরব রহিয়াছে। তাহাদের এই নীরবতাই জেহাদি ও অপরাধীদের শক্তি সরবরাহ করিয়া চলিয়াছে। জেহাদিদের পৃষ্ঠপোষক, অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষক এবং সর্বপ্রকার দুর্নীতির মদতদাতা এই রাজ্য সরকারের পরিবর্তন না করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদিগের ভাগ্যও যে দুর্ভাগ্যে পরিণত হইবে, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুভাষিতম্

অধীত্য চতুরো বেদান্ সর্বশাস্ত্রান্যনেকশঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং না জানাতি দর্বী সূপরসং যথা।।

অর্থ ঃ চার বেদ এবং সমস্ত শাস্ত্র বহুবার অধ্যয়নের পরও যে ব্রহ্মতত্ত্ব জানতে পারে না, তাকে ব্যঞ্জনরসের স্বাদ গ্রহণে অক্ষম হাতার সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

কেউ না চাইলেও ২০২৬-এর ভোটে মানুষ পরিবর্তন আনবেই

জালিয়াতরা খেলছে জুয়া

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

২০২৬-এর রাজ্য ভোটে তৃণমূলকে হটানোর জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসী। এবারের ভোটে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ভালো ফল করলেই তৃণমূলের পরকাল লেখা হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে ভোটারদের মধ্যে সে ধারণাই বদ্ধমূল। তৃণমূলের ভিত এতটাই নড়বড়ে যে, ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছে গিয়ে তাদের সরাতে চলেছে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক শক্তি। এটাই তৃণমূলের ভবিতব্য আর ভোটারদের বিশ্বাস। রাজনৈতিক বহু কিছু অনিবার্যতার মধ্যে দিয়েই এগোয়। এটা লক্ষণীয় বিষয় যে, ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে সে অনিবার্যতা উদাহরণ হয় কিনা। মানুষের সঙ্গে কথা বলে এই প্রতিবেদক অন্তত এই আঁচটাই পাচ্ছে যে, এবারের ভোট পালটানোর ভোট। বিশ্লেষণের ভুল হতেই পারে। তবে মনে হয় সেই ভুল ততটা নয়, যতটা সাধারণভাবে মনে হতে পারে। তৃণমূল যদি ২১৫ থেকে নেমে ম্যাজিক ফিগারের কমে এবার আটকে যায় এবং বিজেপি ৭৭ আসন (এখন ৬৬) থেকে বেড়ে তৃণমূলের আসন সংখ্যা অতিক্রম করতে পারে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে ২০২৬-এর ভোট বিজেপি জিতে গিয়েছে।

এই মুহূর্তে বিজেপি এক নম্বর সর্বভারতীয় দল, তাই তাদের পক্ষে একটি রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য অধৈর্য না হওয়াটাই স্বাভাবিক। দিল্লি আর ওড়িশা জয়ের জন্য দুই থেকে তিন দশক অপেক্ষা করেছিল বিজেপি। ২০২৪- এর লোকসভা ভোটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়েও তার পরবর্তী পর্যায়ে পাঁচটি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন বিজেপি অনায়াসে জেতে। এই মুহূর্তে আসন্ন পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে গদি ওলটানোর ভোট হয় কী না তা দেখতেই উদ্‌গ্রীব ভোটাররা। অসমে এগিয়ে বিজেপি। সম্প্রতি কেরলে তিরুবনন্তপুরম পুরসভায় জয়যুক্ত হয়েছে বিজেপি। কেরল বিধানসভাতেও বিজেপির ফল এবার ভালো হওয়ার সম্ভাবনা। তামিলনাড়ুতে এবার এআইএডিএমকে-বিজেপি জোটের হাতে পরাজিত হতে পারে ডিএমকে- কংগ্রেস জোট। কেবল পশ্চিমবঙ্গ নিয়েই একটা কী হয়, কী হয় ভাব। দিল্লির বাসিন্দা এক সাংবাদিক বন্ধু বললেন যে, বিহারে পালটায়নি, পশ্চিমবঙ্গে কি পালটাবে? তার কথায় এই প্রতিবেদকের সন্দেহ রয়েছে এটা বুঝতে পেরে জুড়ে দিলেন, তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী-নির্ভর তৃণমূল আর এগোবে না, কেবল পিছোতেই থাকবে। পশ্চিমবঙ্গে এখন বিজেপির এগিয়ে যাওয়ার পালা। যে যাই দাবি করুন না কেন, ২০২৬-এর ভোটে নতুন পরিবর্তন আসবেই। কিন্তু এই পরিবর্তনটা কোন দিকে? কেউ যদি এই প্রতিবেদককে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কোন দলে। গুপি বাঘার মতো হয়তো উত্তর দিতে হবে, 'আমি ভালোর দলে'। তাহলে কোনটা খারাপের দল? রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসই এর একটা সহজ উত্তর তৈরি করে দিয়েছে। কারণ স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল শাসনের বিপ্রতীপে খারাপ কিছু হতে পারে অথবা থাকতে পারে বলে রাজ্যের মানুষ মেনে নিতে শুরু করেছেন। শুনতে অবাক লাগলেও সত্যিটা হলো, রাজ্যের বুকে তৃণমূল দলের উলটোটাই আসলে খারাপ। কিন্তু কত খারাপ? প্রথম দু'টি বিষয়ে প্রমাণ দাখিল করতে না পারলেও, শেষ প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সম্ভব। ১৫ বছর ধরে রাজ্যের তৃণমূলের তানাশাহির সরকার চলছে। রাজ্যের মানুষ মুখ বুজে তা মেনে নিচ্ছেন। সেটাই খারাপ!

তবে রাজ্যবাসীর মনে হচ্ছে যেন এবার 'শেষ'-এর শুরু হতে চলেছে। 'শেষ' হবে কী না তা যদিও কারও জানা নেই। তবে মানুষ 'ফিনিশিং' বা শেষ লাইন দেখতে পেয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, মানসিকভাবে হয়ে গিয়েছে এই রাজ্যের ভোট। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর তা আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। বোঝা যাবে কতটা দুধ আর কতটা জল নিয়ে তৃণমূলের তানাশাহির সরকার। কিছুটা স্পষ্ট হবে যে, কবে ও কীভাবে তার শেষ হবে। এই প্রক্রিয়া আটকাতে কিছু অল্পশিক্ষিত, রাজনৈতিক জালিয়াতরা পথে নেমেছে। তারা প্রসঙ্গান্তর ঘটাচ্ছে। জন্মভূমি আর কর্মভূমির বিন্যাসের ভুল তত্ত্ব আউড়ে বাজার গরম করছে। জালিয়াতদের মধ্যে যারা নির্বাচিত আর রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত অংশ, তারা দাঁড়ে বসে নজর রাখছে।

তৃণমূল যখন ক্ষমতায় আসে, বিদেশি সিপিএম তার আগেই তাদের নিজেদের কবরলিপি বা এপিটাফ লিখে ফেলেছিল। ফলে সিপিএম-কে সরাতে তৃণমূলনেত্রীকে আলাদাভাবে কোনো উদ্যোগ নিতে হয়নি। ২০০৬-এর সিঙ্গুর আর ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অনেক আগেই রাজ্যের ভোটাররা একপ্রকার ঠিক করে ফেলেছিল যে, সিপিএম-কে তারা ক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। এককভাবে সিপিএম ২০০১-এর রাজ্য বিধানসভা ভোটে হেরে যায়। এই মুহূর্তে রাজ্যে সেই পরিস্থিতি। তৃণমূলের ১৫ বছরের অপশাসন বিদেশি বামেদের তিন দশকের পাহাড় প্রমাণ অত্যাচার আর দুর্নীতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। রাজ্যের মানুষ তা বুঝতে পারলেও তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কেন ধন্দে পড়ে রয়েছেন, তা রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলকেই দেখতে হবে। এই বিষয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে আর তা কাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। জালিয়াতদের জালিয়াতি রুখতে মানুষকে যেমন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তেমনই তৎপর হতে হবে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলকেও। *(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)*

রুমাল যখন বেড়াল হয়

টাকা লোপাটেষু দিদি,

১০০ কোটি টাকা লোপাট হয়ে গিয়েছে। কে নিল, কে নিল খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আপনার ভাই, ভাইপোরাই সবটা চুরি করে নিয়েছে। আসলে টাকাটা কাদের পাওয়ার কথা ছিল! অবশ্যই গরিব মানুষদের। আপনি নিজেকে যাঁদের মসিহা বলে দাবি করেন। কিন্তু সেই টাকা লুঠ করে নিয়েছে আপনার পয়সাওয়ালা ভাইয়েরা।

পুরোটা ভেঙেই বলি দিদি। ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল। আর সেই বেড়ালটা গোটা রুমালটাই খেয়ে ফেলেছে। বন্যায় মাটির বাড়ি ভেঙেছে। অথচ মাটির বাড়ির জায়গায় পাকাবাড়ির ক্ষতি দেখিয়ে ১০০ কোটি টাকা লোপাট হয়ে গিয়েছে। এমনই সব বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে ক্যাগ রিপোর্টে। 'ক্যাগ' মানে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল। এই সংস্থাটি দেশের সব রাজ্য সরকারের এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের যে খরচের হিসাবপত্র তা অডিট করে।

দিদি এটাকে কিন্তু কেন্দ্র এই রাজ্যের বদনাম করছে বলা যাবে না। ভারতীয় সংবিধানের ১৪৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত সাংবিধানিক সংস্থা 'ক্যাগ' দেশের সবচেয়ে বড়ো হিসাব পরীক্ষক সংস্থা। সেই ক্যাগ আমাদের রাজ্যের একটা জেলার একটা বন্যা নিয়ে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে উঠে এসেছে ভয়ানক ছবি! ৭০০ পৃষ্ঠার রিপোর্টে মূল যে বিষয়টি বলা হয়েছে, তাতে নবান্ন তথা রাজ্য সরকারের ১০০ কোটি টাকা লোপাট হয়ে গিয়েছে বলে খবর।

২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ভোটের আগে কীভাবে নিয়মের তোয়াক্কা না করে ইচ্ছেমতো তৃণমূল এবং তার নেতা ও প্রভাবশালীরা এই টাকাপয়সা ভাগ করে নিয়েছেন তা শুনলে দিদি আপনার কান দিয়েও আগুন ছুটবে। যদিও আপনি সবটাই জানেন। কারণ, আপনাকে না জানিয়ে এ রাজ্যে কোথাও গাছ থেকে পাতাও পড়ে না।

২০১৭ সালে মালদহ জেলায় বন্যা হয়েছিল। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কাঁচা বাড়ি ভেঙে গিয়েছিল অনেক। তাদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ১৭ হাজার ৬০০ টাকা করে দেওয়ার কথা। পাকা বাড়ি ভাঙলে প্রাপ্য হয় ৭০ হাজার। তাই কাঁচা বাড়িকে পাকা বাড়ি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়ি পিছু ৭০ হাজার টাকা। ক্যাগ রিপোর্ট বলছে, জেলায় ১,৬০৯টি পাকা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত দেখিয়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা বাড়তি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ জেলাশাসকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বন্যায় কোনো পাকাবাড়ির ক্ষতিই হয়নি।

রিপোর্ট আরও বলছে, একই বাড়ির ক্ষতির জন্য ৬,৯৬৫ জনকে একাধিকবার ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয়েছে একই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। হরিশচন্দ্রপুর-২ ব্লকে তো মারাত্মক হাস্যকর এবং দুঃখজনক ঘটনা। একজন ব্যক্তিকেই একটি বাড়ি ভেঙে যাওয়ার জন্য মোট ৪২ বার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। সেই ব্যক্তির বাড়ির আদৌ ক্ষতি হয়েছে কি না, তা না দেখে তাকে ৭ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ভাবা যায় দিদি! এ তো লটারি পাওয়ার মতো বিষয়।

ওই বন্যায় মালদহে ১৩টি ব্লকে প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রায় ৭১ হাজার কাঁচা বাড়ি ধ্বংস হয় বলে রিপোর্ট দেন জেলাশাসক। ক্ষতিপূরণের জন্য ১০০ কোটি টাকা চেয়ে আবেদন জানায় জেলা প্রশাসন। তারপরে ক্ষতিপূরণের টাকা ঢুকতেই দুর্নীতি শুরু।

ক্যাগ রিপোর্ট বলছে, লক্ষ লক্ষ টাকা এমন ব্যক্তিদের বিলি করা হয়েছে, যাদের নাম ক্ষতগ্রস্তদের তালিকাতেই নেই। তারা আবেদনও করেননি অথচ টাকা পেয়েছেন। সেই টাকা পরে তাদের থেকে কারা নিয়ে নিয়েছে বলুন তো দিদি! সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি, বিডিও-র প্রতিনিধি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতাকে নিয়ে চার জনের কমিটি করার কথা ছিল। ক্যাগের বক্তব্য, সিংহভাগ ক্ষেত্রেই এই নিয়ম মানা হয়নি। সরকারি নথি বলছে, মানিকচক, পুরাতন মালদা, ইংরেজবাজার, কালিয়াচক-১, রতুয়া-১ ব্লকের ক্ষেত্রে না বিডিও-র প্রতিনিধি, না বিরোধী দলনেতা— কারও সুপারিশ ছিল না। ক্যাগের রিপোর্ট অনুযায়ী, পুরাতন মালদা ব্লকে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ১,৯০৪ জন ক্ষতিগ্রস্তকে। অথচ অডিট করতে গিয়ে তাদের নথি চাওয়া হলে ব্লক প্রশাসন জানায়, বেশ কয়েকটি নথি হারিয়ে গিয়েছে। অথচ, হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ কিন্তু কোনো থানায় দায়ের করা হয়নি।

যেখানে কাঁচা বাড়ির ক্ষতির জন্য ১৭ হাজার ৬০০ টাকা করে দেওয়ার কথা, সেখানে পাকা বাড়ির ক্ষতি দেখিয়ে ৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্যাগ রিপোর্ট বলছে, ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে একই ব্যক্তিকে একাধিকবার ক্ষতিপূরণ দিয়ে।

ক্যাগের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতির ৩৬ জন নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক দেখিয়ে ২৬ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। তারা কেউই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন না। সকলেই সরকারি বেতন পান। আবার ৭২ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সরকারি বেতন পাওয়া সত্ত্বেও বন্যায় নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত দেখিয়ে টাকা তুলেছেন বলে রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে। আসলে তো গরিব মানুষদের ওই টাকা পাওয়ার কথা। বন্যা যাঁদের ঘর, সংসার, গৃহস্থালি কেড়ে নিয়েছিল। সেই গরিবের টাকা দিদি। কী বলি বলুন তো! আমি জানি আপনি সব জানেন, কিন্তু মুখে বলতে লজ্জা এবং কষ্টও হচ্ছে। এত লোভ! □

অতিথি কলম



অধ্যাপক সঞ্জয় দ্বিবেদী

সঙ্ঘ, সমাজ ও রাজনীতি

কোনো রাজনৈতিক দল সঙ্ঘের সমালোচনা করছে, কিন্তু সঙ্ঘ তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা অভিযোগে নিশ্চুপ থেকেছে। কেননা এইসব অভিযোগের উত্তর দিয়ে সঙ্ঘ ভ্রষ্ট রাজনীতির শরিক হতে চায় না।

একটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্রে বাস করে কেউ কি রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারেন? নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ জীবনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, তার থেকে দূরে থাকা কি সম্ভব? রাজনৈতিক ক্ষমতা বিনা সমাজ পরিবর্তন কি সম্ভব? সমাজের কি নিজস্ব শক্তি থাকে, যখন তা রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? এই ধরনের অনেক প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিচলিত করে। এমন আবহে যে সংগঠন শতবর্ষ পূর্ণ করেছে তার কাছে রাজনীতি ও ক্ষমতার তাৎপর্য কতটা? ক্ষমতার রাজনীতি তাকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে? গণতন্ত্রে পরিবর্তনের রাজনীতি এবং ক্ষমতার রাজনীতির বিমর্শে রাষ্ট্রীয় স্বংসেবক সঙ্ঘ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তা বিচার করা জরুরি হয়ে পড়ে। সঙ্ঘ এমন এক সংগঠনে পরিণত হয়েছে যা সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার উপস্থিতির স্বাক্ষর রেখেছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উজ্জ্বল পদচিহ্ন প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতার মানদণ্ড হয়ে উঠেছে। এটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন হলেও এর মূল কাজ হলো দৈনিক শাখা। কিন্তু এখন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা শাসন ব্যবস্থার গভীরে পর্যন্ত নিজেদের বৈচারিক ও সাংগঠনিক ছাপ রেখে চলেছে।

সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা তথা আদ্য সরসঙ্ঘচালক ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের স্বপ্ন ছিল, জাতীয় চেতনা জাগ্রত করা, সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলা এবং হাজার বছরের দাসত্বের ফলে সৃষ্ট আত্মদৈন্য নির্মূল করে হিন্দু সমাজের শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। এই ভাবনাকে মাথায় রেখে ডাক্তারজী এমন একটি সংগঠনের কল্পনা করেন যা ধর্ম, ভাষা, প্রদেশের ঊর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ জাতি এক সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রীয়তার ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হবে। সঙ্ঘের শাখাগুলি এই কার্যপদ্ধতির মেরুদণ্ডস্বরূপ হয়ে ওঠে। প্রতিদিন এক ঘণ্টার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে শারীরিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষাগ্রহণ করাই সঙ্ঘ শাখার আত্মাস্বরূপ। এভাবে ধীরে ধীরে সুশৃঙ্খল, দেশভক্ত ও সংস্কারিত ব্যক্তি নির্মাণ হয়, যাদের স্বয়ংসেবক বলা হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ব্যক্তি নির্মাণের মাধ্যমে রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। এই প্রক্রিয়ায় চরিত্র নির্মাণ ও কর্তব্যনিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়া হয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৌঁছনোর জন্য স্বয়ংসেবকরা বিবিধ সংগঠন তৈরি করেছেন, কিন্তু তারও মূল উদ্দেশ্য হলো জাতির স্বাভিমান জাগ্রত করে রাষ্ট্র নির্মাণ করা। অন্যদিকে স্বয়ংসেবকরা রাজনীতি ও ক্ষমতার শীর্ষে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গেও নিরন্তর আলাপ-আলোচনা বজায় রেখেছে। গান্ধীজী, ডঃ বাবাসাহেব ভীমরাও রামজী আম্বেদকর, জয়প্রকাশ নারায়ণ, জওহরলাল নেহরু থেকে ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত সবার সঙ্গে স্বয়ংসেবকরা সম্পর্ক রেখেছিলেন। নিজেদের মতামত প্রকাশ করা এবং আদর্শের ওপর দৃঢ় সংকল্প থাকা স্বয়ংসেবকদের মৌলিক স্বভাব। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেও 'ক্ষমতার মোহ' কখনোও তাদের গ্রাস করতে পারেনি। ১৯৫১ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জনসঙ্ঘ স্থাপনে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। প্রশিক্ষিত প্রচারকদের দ্বারা সেই সহযোগিতা করা হয়েছিল। ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠনের সময় সঙ্ঘের অনেক অভিজ্ঞ কার্যকর্তাকে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্ঘ অনেক প্রচারক ও কার্যকর্তাকে বিজেপিতে পাঠায় কিন্তু সঙ্ঘ তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করে না, তাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করে থাকেন। ক্ষমতার রাজনীতিতেও রাষ্ট্রভাব জাগ্রত হোক, এই মানসিকতাই তাঁদের থাকে। ১৯৪৮ সালে গান্ধীহত্যার মিথ্যা অভিযোগে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করে স্বয়ংসেবকদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়েছিল। তখন রাজনীতিতে সঙ্ঘের পক্ষে কথা বলার কেউ ছিলেন না। ভয়ংকর সরকারি অত্যাচারেও স্বয়ংসেবকরা সংযম রেখেছিলেন। একসময় আদালতের রায়ে এই মিথ্যা অভিযোগ থেকে সঙ্ঘ মুক্ত হয় এবং নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়।

দেশসেবার মনোভাব এবং এরকম সম্পর্ক রাখার কারণে চীনযুদ্ধের পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৩ সালে গণতন্ত্র দিবেসের প্যারেডে অংশগ্রহণের জন্য স্বয়ংসেবকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের কার্যকর্তা স্বয়ংসেবক কৃষ্ণলাল প্যাটেল বলেন, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে স্বয়ংসেবকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৩ সালের গণতন্ত্র দিবেসের প্যারেডে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আমার মনে আছে, আমিও ওই সঞ্চলনে অংশ নিয়েছিলাম। দিল্লির রাজপথে আমরা যখন চলছিলাম তখন রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে মানুষ

আমাদের হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমরা ৩৫০০ স্বয়ংসেবক ওই প্যারেডে অংশ নিয়েছিলাম।'

সঙ্ঘ সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকদের প্রেরণ করেছে কিন্তু নিজের ভূমিকা ব্যক্তি নির্মাণ ও পথনির্দেশ পর্যন্ত সীমিত রেখেছে। দৈনন্দিন রাজনীতির কূটকাচালি থেকে দূরে থেকে সমাজ জাগরণ এবং দৈনিক শাখার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে। এজন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আজ কেবল একটি সংগঠন নয়, বৌদ্ধিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। সঙ্ঘ ভারতীয় সমাজে অনুশাসন, সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক চেতনার পুনর্জাগরণ সৃষ্টি করেছে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হয়েও জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বরাবর সম্পর্ক রেখে চলেছে। তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে পত্রালাপও করেছেন। সঙ্ঘকে কেউ উপেক্ষা করলেও সঙ্ঘ কাউকে অচ্ছুত মনে করে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকেরা স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য প্রকল্প ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সঙ্ঘ কোনো স্থবির সংগঠন নয়, এটি সমাজজীবনের প্রতিটি প্রবাহের সঙ্গে নিরন্তর সম্পর্ক বজায় রাখে, দৃষ্টি রাখে এবং তার জাতীয় অবদানকে স্বীকৃতি দেয়। এরকম সেবা ও সমর্পণই হলো সঙ্ঘের মূল মন্ত্র।

সঙ্ঘ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে স্বয়ংসেবকরা অনেক স্বতন্ত্র সংগঠন স্থাপন করেছেন। তার মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিও একটি। এই সংগঠনগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংলাপ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু নিয়ন্ত্রণের কোনো ভাব নেই। প্রতিটি সংগঠন তার নিজস্ব ব্যবস্থায় পরিচালিত এবং আত্মনির্ভর। তাদের সঙ্গে সংলাপ আদর্শের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। সমান বিষয়গুলিতে সমান সিদ্ধান্ত এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়। ১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী ও নানাজী দেশমুখের মতো স্বয়ংসেবকরা যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৭ সালে জনসঙ্ঘ জনতা পার্টিতে বিলয় হয়। কিন্তু মতভেদ ও দ্বৈত সদস্যপদ নিয়ে বিরোধিতার কারণে সেই প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। তাই ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হয় যার একটি শক্তিশালী সঙ্ঘ অনুপ্রাণিত আদর্শগত ভিত্তি ও সাংগঠনিক সমর্থন রয়েছে।

সঙ্ঘ ক্ষমতা বা রাজনৈতিক দলের সমর্থনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের বদলে ব্যক্তি নির্মাণকে অগ্রাধিকার দেয়। সঙ্ঘ বিশ্বাস করে, পরিবর্তন তখনই সফল হবে যখন মানুষ তার জন্য প্রস্তুত থাকবে। স্বয়ংসেবকরা সেজন্যই হিন্দিতে একটি গান করেন—

'কেবল সত্তা সে মত্ করনা পরিবর্তন কী আস।

জাগ্রত জনতা কে কেন্দ্র সে হোগা অমর সমাজ।।'

অর্থাৎ, কেবল ক্ষমতা থেকে পরিবর্তনের আশা করো না, জাগ্রত মানুষদের কেন্দ্র করে হবে অমর সমাজ নির্মাণ।

সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক শক্তিকে জাগ্রত করে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তাদের সহযোগী করা। নির্বাচনের সময় নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ভোটদানের শতাংশ বৃদ্ধি করতে স্বয়ংসেবকদের জনজাগরণ অভিযানে অংশগ্রহণ করা একটি উদাহরণ। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে নাগরিকদের অংশদারিত্ব সুনিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাজনীতিতে খ্যাতি একটি অপরিহার্য বিষয়। নেতারা তাদের ব্যক্তিগত মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নানারকমের ব্যবস্থা করেন। সঙ্ঘ তাই জেনে-বুঝেই স্বয়ংসেবকদের প্রসিদ্ধিপরাঙ্মুখতার মানসিকতা নির্মাণ করেছে। স্বয়ংসেবকরা শাখায় একটি গান করেন যার অর্থ হলো, আমার নাম সংবাদপত্রে ছাপা হবে, আমি সম্মান ও অভিনন্দনস্বরূপ হার পরবো, এই সংকীর্ণ ভাবনাকে ত্যাগ করে চলো, কারণ আমরা হিন্দুরাষ্ট্রের ত্রাণকর্তা। বাস্তবে সমাজজীবনে বাস করে এরূপ সংকল্প পালন করা খুবই কঠিন। কিন্তু সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি এমনই যে এরকম সংকল্প স্বয়ংসবেকদের কাছে খুবই সহজ। আজকের প্রযুক্তির যুগেও ব্যক্তি-ব্যক্তি সম্পর্ক ও আত্মীয়তা নির্মাণ সঙ্ঘের এক শৈলীতে পরিণত হয়েছে।

সঙ্ঘের এই একশো বছরে বহু স্বয়ংসেবক পদমর্যাদায় শীর্ষে পৌঁছেছেন। অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবাণী এবং নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও এই তালিকা দীর্ঘ। তাঁদের প্রেরণাস্থান হলো সঙ্ঘ। তাঁদের জীবন সঙ্ঘময়। সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ শুধু আদর্শগত ভিত্তি দৃঢ় করে না, বরং সংগঠনাত্মক অনুশাসন, জনসম্পর্ক কৌশল এবং সেবাভাবেও ওতপ্রোত করে। এই কারণেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা নেতা হয়েও রাজনৈতিক দৃষ্টিতে অধিকতর প্রভাবশালী, সুশৃঙ্খল ও নীতিনিষ্ঠ হয়ে থাকেন। স্বয়ংসেবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যই সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ নীতি নির্মাণ ও ক্রিয়ান্বয়নে পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। স্বয়ংসেবকদের কারণেই রাষ্ট্রীয়তার ভাবনা সরকারি নীতিতে অগ্রধিকার পাচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ, ৩৭০ ধারা বাতিল, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মতো সিদ্ধান্তগুলি সঙ্ঘের আদর্শগত দিকগুলিকেই প্রকাশ করে। একেই বলা পরিবর্তনের রাজনীতি।

সঙ্ঘ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে নেই কিন্তু তবু এর আদর্শ রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। কোনো রাজনৈতিক দল সঙ্ঘের সমালোচনা করেছে, কিন্তু সঙ্ঘ তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা অভিযোগে নিশ্চুপ থেকেছে। কেননা এইসব অভিযোগের উত্তর দিয়ে সঙ্ঘ ভ্রষ্ট রাজনীতির শরিক হতে চায় না। আজ সমাজ সঙ্ঘকে জানার জন্য উন্মুখ। মানুষ সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে চাইছে। সঙ্ঘের একজন কার্যকর্তা বলেছেন, 'ভারতকে জানো, ভারতকে মানো, ভারতের হও, ভারতকে বানাও'। আজ এই পরিবর্তনের সময় সঙ্ঘের জন্য এটা একটা সুযোগও বটে, পরীক্ষাও বটে।

(লেখক পূর্বতন উপাধ্যক্ষ, এম সি ইউ, ভোপাল)

শোকসংবাদ

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পানিহাটি নগরের স্বয়ংসেবক প্রদীপ দাসের বাবা কালীপদ দাস গত ২০ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ কি আদৌ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার?

কেন্দ্রীয় সরকার কি আদৌ পশ্চিমবঙ্গকে কখনও বঞ্চনা করেছে? ইতিহাস ও বর্তমান ঠিক উলটোটাই বলে। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলগুলির অভিযোগ মোটামুটি সাড়ে চার দশকের। মিশ্র অর্থনীতির যে চারটি মূল ভিত্তি ছিল, তার তিনটিই ছিল বৈষম্যমূলক। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা জোটের বিরোধী হওয়ায় এই চারটি বিষয় ছিল তাদের অস্ত্র হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। এই চারটি অস্ত্র হলো— (১) লাইসেন্স ও পারমিট রাজ, (২) কোটা রাজ, (৩) মাশুল সমীকরণ, (৪) ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট বা ফেরা। এর মধ্যে প্রথম তিনটিকে হাতিয়ার করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অপদার্থ শাসক দল, বিশেষত বামেরা বারবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হলো কেন্দ্রীয় নীতি, কেন্দ্রের অসহযোগিতা এবং বিমাতৃসুলভ আচরণের কারণেই পিছিয়ে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গ— বারবার এই অভিযোগে সরব হয়েছে প্রথমে বামফ্রন্ট ও পরে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার। এই সাড়ে চার দশকের মধ্যে পালটেছে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দল। নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের জায়গায় ক্ষমতায় এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট আর রাজ্যে বামফ্রন্টের জায়গা নিয়েছে তৃণমূল। সেই দিনের রাজনৈতিক শত্রু কংগ্রেস ও সিপিএম আজ বন্ধু হয়ে গিয়েছে। আর বাম আমল থেকে রাজ্যের মানুষের মনে গেঁথে যাওয়া 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র অস্ত্রটা হাতে তুলে নিয়েছে তৃণমূল এবং ব্যবহার করছে আজকের দিল্লির শাসক দলের বিরুদ্ধে। কিন্তু সত্যটা ঠিক কী? রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্র কতটা কী দিয়েছে সেই হিসাব তুলে ধরার জন্যই আজ এই নিবন্ধের অবতারণা। স্বস্তিকার পরবর্তী সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে কেন্দ্র কী দিয়েছে সেই বিষয়টি আলোচিত হবে। বামফ্রন্ট সরকার জানত যেকোনো অপদার্থতা ও অকর্মণ্যতার ঢাল একটাই। সেটা হলো 'কেন্দ্রের বঞ্চনা'। গত ৪৫ বছর ধরে এই রাজ্যের সরকারি দল ও সংবাদমাধ্যম বাঙ্গালিকে এই মিথ্যা বিশ্বাস করিয়েছে। 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র এই লাগাতার অপপ্রচারের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন হলো তাহলে কি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন পূর্ববর্তী সরকারগুলিও কোনোভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বঞ্চনা করেনি? দেখা যাক স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির তালিকা।

(১) সবুজ বিপ্লবের দশ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গকে ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী ও দামোদর সেচ প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে কেন্দ্র এবং পরবর্তীকালে সেই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। রাজ্যের বাকি জেলার চাষিদের তুলনায় এই তিন নদী অববাহিকার চাষিদের আয় বাড়ে বহুগুণ। ময়ূরাক্ষী ও ডিভিসি রূপায়ণের দশ বছর পর বাকি দেশে ভারত সরকার শুরু করে সবুজ বিপ্লব। (২) দুর্গাপুর, হলদিয়া, কল্যাণী, সল্টলেক, শিলিগুড়ির নগরোন্নয়ন এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে কে টাকা দিয়েছে? পশ্চিমবঙ্গের এই স্থানগুলি আজ যেন বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একসময় এই জায়গাগুলিতে বহু শিল্প এসেছে। কর্মসংস্থান হয়েছে হাজার হাজার মানুষের। পূর্ববঙ্গের বহু শরণার্থী পরিবার, স্বাধীনতার পর যারা দমদম ও যাদবপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের পরিবারের সন্তানেরা এইসব স্থানে জীবিকার সন্ধান পেয়েছিলেন। (৩) পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও কৃষিতে জল সরবরাহের জন্য কেন্দ্র দু'বার আন্তর্জাতিক আইন ভাঙে। রূপায়িত হয় তিস্তা ও ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প। আর কোন রাজ্যের জন্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এই ধরনের আইন ভাঙার দৃষ্টান্ত রয়েছে? (৪) প্রথম আইআইটি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, খড়্গপুরে। কেন? কারণ ভারত সরকার চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ দেশকে শিল্পে নেতৃত্ব দিক। (৫) দেশের মধ্যে প্রথম আইআইএম হলো 'আইআইএম, কলকাতা'। কেন দেশের মধ্যে প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান কলকাতাকে দেওয়া হলো? মুম্বই ও দিল্লি কিন্তু তখনও আইআইএম পায়নি। (৬) ২০০০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশ ছাড়া আইআইটি, আইআইএম দু'টিই পায়নি দেশের অন্য কোনো রাজ্য। (৭) দেশের মধ্যে প্রথম মেট্রো রেল প্রকল্প কে পেয়েছে? উত্তর হলো--- কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গের ২৮ বছর মেট্রো প্রকল্প পায় দিল্লি। তারপর অন্য রাজ্যগুলি। (৮) দেশের মধ্যে প্রথম কেবল্ ব্রিজ কোথায় নির্মিত হয়? কেন্দ্রের আর্থিক সহযোগিতায় তৈরি হয় 'বিদ্যাসাগর সেতু'। কলকাতার অন্যতম ব্যবসা করিডোর এই সেতু। (৯) বাম আমলে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড. অশোক মিত্র, ড. অসীম দাশগুপ্ত এবং তাদের ভক্তরা দাবি করেন যে, মাশুল সমীকরণ নাকি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকে ডুবিয়েছে। ১৯৯৩ সালে মাশুল সমীকরণ উঠে গিয়েছে। তারপরেও ১৮ বছর ড. দাশগুপ্ত রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। এই পর্যায়ে একটিও বড়ো শিল্প কি অপদার্থ বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে আনতে পেরেছে? (১০) অনেকে আবার রাজ্যের অর্থনৈতিক অবনতির জন্য লাইসেন্স প্রথাকে দোষ দেয়। লাইসেন্স ও পারমিট রাজ ছিল গোটা দেশের জন্য অভিশাপ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গর জন্য? উপরোক্ত পাঁচটি শিল্পনগরী, বন্দর, পাঁচটি জলসেচ প্রকল্প, প্রথম মেট্রো, প্রথম আইআইটি, আইআইএম, আইআইএসডব্লুবিএম— এত কিছুর লাইসেন্স যে রাজ্য একা পেয়েছে, তার প্রতি বঞ্চনা হয়েছে নাকি এই লাইসেন্স রাজের সবচেয়ে বড়ো সুবিধাভোগী তারাই?

গত ৭৫ বছর ধরে এত কিছু পাওয়ার পরও এই রাজ্য সার্বিকভাবে ব্যর্থ হলে তার দায় কেন্দ্রের? প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কোনো ছাত্র ব্যর্থ হলে দায় তার ঠাকুর্দার? বাঙ্গালিকে দেশের বিরুদ্ধে উসকে আরেকটা খালিস্তান তৈরির যে যুদ্ধে প্রথম সারির বাঙ্গালি দৈনিকগুলি নেমেছে, সেটাকে আরও একটু উসকে দিচ্ছে এক শ্রেণীর ইলেকট্রনিক মিডিয়া। যদি নয়াদিল্লি পশ্চিমবঙ্গ -বিরোধীই হয় তবে কেন এতগুলি প্রকল্প প্রথমবার পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ? কেন এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক আইন ভাঙতে দ্বিধা করেনি নয়াদিল্লি? মিথ্যা বাঙ্গালি আঞ্চলিকতাবাদ তৈরি এবং সিপিএম-কে এগিয়ে এনে রাজ্যে বিরোধী ভোট বিভাজনের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও অব্যাহত রয়েছে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র অপপ্রচার।

দীপুচন্দ্র দাস থেকে বাবরের ছায়া : চরমপন্থী মানসিকতার বিরুদ্ধে ভারতের বিবেকের লড়াই

সাধন কুমার পাল

দীপুচন্দ্র দাসকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে বাংলাদেশে। সে ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়— তা ছিল একটি বিকৃত মানসিকতার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। যে আদর্শ মানুষকে উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে বিচার করে এবং ভিন্ন পরিচয়কে নিশ্চিহ্ন করাকেই মজহবি কর্তব্য মনে করে। এই আদর্শের নাম শুধু জেহাদ নয়, এই আদর্শের নাম অসহিষ্ণু চরমপন্থা, উগ্রপন্থা। দুঃখজনক সত্য হলো— এই মানসিকতা দেশ-কাল, সীমান্ত মানে না।

আজ যখন ভারতে আবার 'বাবরি মসজিদ' ইস্যুকে উসকে তোলা হচ্ছে, যখন সামাজিক মাধ্যমে তলোয়ার হাতে ভিডিয়ো বানিয়ে ভয় দেখানোর ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন প্রশ্ন ওঠে— এটা কি মজহব, নাকি ক্ষমতার রাজনীতি? এটা কি ঈশ্বরের সাধনা, নাকি ইতিহাসের ক্ষত খুঁচিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টির প্রয়াস?

বাবর কোনো ভারতীয় ছিল না। তার কোনো ভারতীয় সাংস্কৃতিক মূল ছিল না। ইতিহাস বলে--- তার শাসন ছিল আক্রমণাত্মক, ভয়ংকর। তার সংস্কৃতি ছিল লুঠপাট, নরহত্যা ও রাজনীতির হাতিয়ার। তার মন্দির ধ্বংসের বহু ঘটনা ইতিহাসে নথিভুক্ত। এগুলো কোনো গল্পকথা নয়, আবার প্রতিশোধের আহ্বানও নয়। এগুলো সতর্কবার্তা। কারণ ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে ইতিহাসই আবার ফিরে আসে— নতুন মুখে, নতুন প্রযুক্তিতে, নতুন ভাষায়। মধ্য এশিয়া থেকে আগত বাবর ছিলেন তুর্কি-মঙ্গোল বংশোদ্ভূত, যার পূর্বপুরুষদের মধ্যে তৈমুর লঙের মতো শাসকও ছিল যে বহু স্থানে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ও অমানবিক নিপীড়নের জন্য কুখ্যাত। বাবর নিজেই তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-বাবরি'-তে স্বীকার করেছে যে, ভারত আক্রমণের সময় সে বহু শহর ও জনপদ ধ্বংস করেছিল। বিশেষ করে হিন্দু মন্দির ও আশ্রমগুলি তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়।

শুধু স্থাপত্য ধ্বংসই নয়, বাবরের শাসনকালে বহু আচার্য, সাধু-সন্ন্যাসী ও ধর্মীয় নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তির উপর অত্যাচার চালানো হয়। ধর্মান্তরণ, মন্দির ভাঙচুর এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ ছিল সেই সময়কার বাস্তবতা। বাবরের পূর্বপুরুষ তৈমুর লংও ভারত আক্রমণের সময় দিল্লি ও আশপাশের অঞ্চলে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালায়, যেখানে অসংখ্য নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান।

যেখানে চরমপন্থাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেখানে ধীরে ধীরে ভিন্নমতের জায়গা সংকুচিত হয়। দীপুচন্দ্র দাসের হত্যাকারীদের মানসিকতা আর যে মানসিকতায় পশ্চিমবঙ্গে তলোয়ার হাতে হুমকির ভাষা ব্যবহার করে— এই দুইয়ের মূল সুর এক।

এই ঘটনাগুলি কেবল অতীতের ইতিহাস নয়, বরং ভারতীয় সমাজের স্মৃতিতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলি স্মরণ করা প্রয়োজন— প্রতিহিংসার জন্য নয়, সত্যকে জানা, বিচার করা এবং ভবিষ্যতে এমন অমানবিকতার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য। আজ যখন বাবরকে প্রতীক বানিয়ে হুমকি, তলোয়ার আর বিভাজনের ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন সেটা মজহবি স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সেটা হয়ে ওঠে চরমপন্থী ও জেহাদি রাজনীতির অঙ্গ। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই ভাবে আক্রমণকারী বাবরকে এই পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা তাদের আইকন করছে।

ঠিক এই জায়গাতেই দীপুচন্দ্র দাসের প্রসঙ্গ আসে। যে মানসিকতা বাংলাদেশে একজন মানুষকে তার পরিচয়ের জন্য আগুনে পুড়িয়ে মারতে পারে, আর যে মানসিকতা ভারতে ভিন্নমতের দিকে তলোয়ার তাক করে কথা বলে— এই দুইয়ের মধ্যে মানসিক ব্যবধান নেই।

এটা কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়। এটা একটি বিকৃত মতবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ভারতের শক্তি— তার বহুত্ববাদ। একসঙ্গে থাকা, আলাদা থেকেও এক হওয়া। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে--- গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক পথে। এটাই ভারতের

সভ্যতার প্রমাণ। এখন সেই অধ্যায়কে বারবার উসকে তোলা ধর্ম নয়, এটা অস্থিরতা তৈরির রাজনীতি। এই অস্থিরতার সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হবে কার? হিন্দুদের? মুসলমানদের? না, ক্ষতি হবে ভারতের। এখানেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নীরবতা কখনো নিরপেক্ষ থাকে না— নীরবতা শেষ পর্যন্ত চরমপন্থার পক্ষেই যায়।

যদি এই বিকৃত মতবাদের বিরুদ্ধে সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে না দাঁড়ায়, তবে চরমপন্থা পুরো সমাজকে গ্রাস করবে এবং তখন ধিক্কৃত পরিচয়ের বোঝা একটি সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কে বহন করতে হবে— যা চরমতম অন্যায়।

দীপুচন্দ্র দাসের জন্য প্রতিবাদ মানে শুধু একটি ঘটনার জন্য শোক নয়। দীপুচন্দ্র দাসের জন্য প্রতিবাদ মানে— হুমকি ও জেহাদি রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। মজহবকে অস্ত্র বানানোর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। ইতিহাসকে ঘৃণার হাতিয়ার বানানোর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। ভারত কোনো জেহাদি সাম্রাজ্য নয়। ভারত একটি সভ্যতার প্রবাহ— যে প্রবাহের নাম হিন্দুত্ব। যেখানে সহাবস্থানই শক্তি। এই শক্তিকে ভাঙতে চাইলে সে যেই হোক, যে নামেই আসুক— তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক, সাংবিধানিক ও নৈতিক প্রতিবাদ গড়ে তোলাই আজকের সবচেয়ে বড়ো দেশপ্রেম।

দীপুচন্দ্র দাসের স্মৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা হলো— ভারতের বহুত্ববাদকে রক্ষা করা। ঘৃণার আগুনে নয়, বিবেকের আলোয়। দীপুচন্দ্র দাস, প্রতিবাদ ও পশ্চিমবঙ্গ : বহুত্ববাদী ভারতের সামনে এক গভীর প্রশ্ন। দীপু চন্দ্র দাসকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে বাংলাদেশে।

এই ঘটনা কেবল একটি দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়— এটি ছিল মানবতার বিরুদ্ধে এক বিকৃত চরমপন্থী মজহবি প্রকাশ, যার প্রতিবাদে আজ ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজ্যেই মানুষ পথে নেমেছে। লক্ষণীয় বিষয়, দেশের কোথাও এই প্রতিবাদে প্রশাসনিক বাধা সৃষ্টি হয়নি। গণতন্ত্র তার স্বাভাবিক পথেই চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে— তবে পশ্চিমবঙ্গ কেন ব্যতিক্রম? পশ্চিমবঙ্গে কেন দীপুচন্দ্র দাসকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে মানুষের বিরুদ্ধে মামলা হয়, কেন পুলিশের লাঠিচার্জ, কেন জেল?

এই প্রশ্ন কোনো দলের বিরুদ্ধে নয়— এটি গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের প্রশ্ন। যখন ভারতের অন্য রাজ্যগুলি একটি মানবিক প্রতিবাদকে স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার হিসেবে মান্যতা দেয়, তখন পশ্চিমবঙ্গে সেই একই প্রতিবাদকে 'অপরাধ' হিসেবে দেখা হচ্ছে কেন? এর উত্তর খুঁজতে গিয়েই ভোটব্যাংক রাজনীতির ভয়ংকর কালান্তক ছায়া সামনে আসে। আজ অনেক মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে, চরমপন্থী ও জেহাদি শক্তির বিরাগভাজন হলে কি পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ভোটের অঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়? মজহবি ও জেহাদি উগ্রতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিলে কি মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার আসন টলে যায়?

এই প্রশ্নগুলো করা অপরাধ নয়। বরং প্রশ্ন না করাই গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে— যেখানে চরমপন্থাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেখানে ধীরে ধীরে ভিন্নমতের জায়গা সংকুচিত হয়। দীপুচন্দ্র দাসের হত্যাকারীদের মানসিকতা আর যে মানসিকতায় পশ্চিমবঙ্গে তলোয়ার হাতে হুমকির ভাষা ব্যবহার করে— এই দুইয়ের মূল সুর এক। এটা কোনো মজহবের বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়। এটা চরমপন্থী রাজনৈতিক-মজহবি-জেহাদি মানসিকতার বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা। ভারতের শক্তি তার সংবিধান, তার বহুত্ববাদ, তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

যখন সেই স্বাধীনতা এক রাজ্যে সংকুচিত হয়, তখন তা শুধু ওই রাজ্যের সমস্যা থাকে না, তা জাতীয় উদ্বেগে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহাসিকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন, স্বাধীন চিন্তা ও প্রতিবাদের ভূমি। সেই পশ্চিমবঙ্গেই যদি আজ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ দমন করা হয়, তবে তা ভবিষ্যতের জন্য অশনিসংকেত।

এই নিবন্ধ কোনো উসকানি নয়। এই নিবন্ধ আইনের শাসন, ন্যায় ও সমান অধিকার রক্ষার আহ্বান। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ— হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ— সকলেরই দায়িত্ব চরমপন্থা, জেহাদ ও পক্ষপাতের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিকভাবে রুখে দাঁড়ানো। কারণ আজ আমরা চুপ থাকি, আগামীদিনে প্রশ্ন করার অধিকারটাই হারাতে পারি।

দীপুচন্দ্র দাসের জন্য প্রতিবাদ মানে শুধু একটি হত্যার বিরুদ্ধে শোক নয়। এটি হলো—

- চরমপন্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
- ভোটব্যাংক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
- প্রশাসনিক পক্ষপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
- জেহাদি মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ভারত কোনো একমাত্রিক দেশ নয়। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩



জেহাদিদের হাত থেকে সনাতনীদের বাঁচান !

ভারত সরকারের কাছে আকুল আবেদন বাংলাদেশি শরণার্থীর

নিজস্ব সংবাদদাতা।। জেহাদিদের হাত থেকে আমাদের সনাতনীদের বাঁচান ! ভারত সরকারের কাছে এমন আকুল আবেদন বাংলাদেশি শরণার্থী বাপ্পাদিত্য বসুর। মেডিক্যাল ভিসায় ভারতে কোনোরকমে পালিয়ে আসা শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম মুখ তথা বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য সমিতির নেতা গত ৩০ ডিসেম্বর কলকাতা প্রেসক্লাবে সনাতনী সংসদের ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করলেন, গত দেড় বছরের দখলদার সরকারের আমলে বাংলাদেশ হিন্দুদের জন্যে নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে।

এদিন কলকাতা প্রেসক্লাবে বাংলাদেশের হিন্দুদের বর্তমান ভয়াবহ অবস্থার কথা তুলে ধরতে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে সনাতনী সংসদ। সনাতনী সংসদের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক রক্তিম দাশ বলেন, আমার এতদিন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের কথা শুনেছি। এতদিন এদেশে পালিয়ে আসা হিন্দুরা কখনো একথা বলার জন্য সামনে আসেননি। এদিন কান্নাভেজা কণ্ঠে বাপ্পাদিত্য বসু বলেন, গত দেড় বছরের দখলদার সরকারের আমলে হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্যে নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। হিন্দুদের পক্ষে সংগ্রাম করার কারণে প্রভু চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে বিনা বিচারে প্রায় চৌদ্দ মাস ধরে জেলবন্দি রাখা হয়েছে। চট্টগ্রামের অ্যাডভোকেট আলিফ হত্যার ঘটনায় দুই শতাধিক হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে রাখা হয়েছে। ময়মনসিংহের হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করেছে। গত দেড় বছরে কেবলমাত্র ইসলাম অবমাননার মিথ্যা ধুয়ো তুলে অন্তত আড়াইশোটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে গরিব রিকশাচালক গোবিন্দ বিশ্বাসকে কেবলমাত্র হাতে লালসুতো থাকার কারণে ভারতীয় এজেন্ট আখ্যা দিয়ে পিটিয়ে ও মাথা ফাটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজবাড়িতে অমৃত মণ্ডল নামের এক হিন্দু যুবককে মিথ্যা অভিযোগ তুলে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ময়মনসিংহের ভালুকায় ব্রজেন্দ্র বিশ্বাস নামের এক হিন্দুকে গুলি করে হত্যা করেছে। চট্টগ্রামের রাউজানের সুলতানপুর গ্রামে দু'টি হিন্দু পরিবারকে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। পিরোজপুরের ৫টি হিন্দু পরিবারকেও একইভাবে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পুরো বাংলাদেশই আজ হিন্দুদের জন্যে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। নীরব ও সরব দু'ভাবেই অত্যাচার চলছেই। সেই সঙ্গে চলছে হিন্দুদের দেশত্যাগ। গত দেড় বছরে অন্তত ২ লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশ থেকে জীবন বাঁচাতে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। স্টেট রিলিজিয়ন হিসেবে ইসলামকে মর্যাদা দানের কারণে জাতিগত সংখ্যালঘু ও জনজাতিরা আজ বাংলাদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২০২৪-এর আগস্ট থেকে অদ্যাবধি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হিন্দুদের ওপর সংঘটিত হিংসার ঘটনা ৩০ হাজারের বেশি। অপ্রকাশিত ঘটনা এর কয়েকগুণ বেশি হবে। হত্যা, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ, জোরপূর্বক জমি-বসতবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল, শারীরিক নির্যাতন ও কর্মস্থল থেকে জোরপূর্বক পদত্যাগ করানো, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বাধা, অপহরণ, চাঁদাবাজি এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ চলছেই। সরকারের পক্ষ থেকে এসব ঘটনাকে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনার, মোড়কে ঢেকে রাখা হলেও প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কারণেই বাংলাদেশ থেকে যে সকল হিন্দু প্রাণ বাঁচাতে ভারতে পালিয়ে এসেছেন, তারা ভারতেও মানবেতর জীবনযাপন করছেন। নাগরিকত্ব না থাকার কারণে তারা ভারতে কোনো কাজ পাচ্ছেন না। ভারতের হোটেলগুলোতে থাকার জায়গা পাচ্ছেন না, বাড়িভাড়া নিতে পারছেন না, চিকিৎসা করাতে পারছেন না। ফলে অর্থাভাবে চিকিৎসার অভাবে ও খাদ্যাভাবে মানবেতর জীবনের দিকে বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে ঠেলে দিয়েছে। আমি ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানাই, বিপদাপন্ন এই বাংলাদেশি হিন্দুদের জন্যে নাগরিকত্ব আইন শিথিল করে তাদের

মানবিক জীবনধারণের পথ সুগম করুন। ভারত সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাপ্পাদিত্য বলেন, সিএএ আইনের অধীনে বর্তমানে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারতে আসা হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে— এজন্যে ভারত সরকারের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু বিপদাপন্ন হিন্দুদের বাঁচাতে এই আইনের সময়সীমা শিথিল করে ২০১৪ সালের পরিবর্তে বর্তমান সময় পর্যন্ত চালু রাখা প্রয়োজন। আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি ভিসা (৫ বছর) ব্যবস্থা সহজ করা প্রয়োজন। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে আসা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষাবলম্বী অন্যান্য ধর্মের রাজনৈতিক কর্মীরাও ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরে মানবেতরভাবে আশ্রিত রয়েছেন। তাদের অনেকেরই ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, অনেকে পাশপোর্টটিও নিয়ে আসতে পারেনি। এই রাজনৈতিক কর্মীদের পরিচয় যথাযথ পরখ করে দীর্ঘমেয়াদি ভিসা অনুমোদন দেওয়া প্রয়োজন। তবে, বাংলাদেশ থেকে কোনো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সদস্য যাতে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশ করে ভারতে কোনো জেহাদি হামলা না ঘটাতে পারে— সে ব্যাপারেও কঠোর নজরদারি রাখা প্রয়োজন। আজকে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ এবং বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর যে বীভৎস ও নারকীয় নিপীড়ন চলছে তার বিপরীতে আবারও নতুন করে ভারতবাসী ও বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে সোচ্চার হবার আহ্বান জানাই।

ইউনুস সরকারের কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, ২০২৪-এর ৫ আগস্ট, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর গত দেড় বছরে বাংলাদেশের দখলদার সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং দেশের জন্ম ইতিহাসকে অস্বীকার করে পাকিস্তানপন্থী ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চলতে শুরু করেছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষাবলম্বীদের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ, স্মৃতিসৌধ, শেখ মুজিবুরের বাসভবন-সহ স্বাধীনতার প্রতীকগুলোর ধ্বংস সাধন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর ধারবাহিক আক্রমণ, সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ এবং ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ ইত্যাকার কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। এক কথায় পুরো বাংলাদেশে এখন আগুন জ্বলছে। অবৈধ দখলদার ইউনুস সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় উগ্র সশস্ত্র জেহাদি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর নব উত্থান হয়েছে। পূর্বে আটককৃত জঙ্গিদেরকে জেল থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি)-এর শীর্ষ নেতা জসিমউদ্দিন রাহমানী, জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর শীর্ষ নেতা আতাউর রহমান বিক্রমপুরী, হরকাতুল জেহাদ (হুজি)-এর শীর্ষ নেতা মুফতি হারুন ইজহারের মতো ভয়ংকর জঙ্গিদের অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এরা এখন প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তৃতা করে ভারতবিরোধী উসকানি, হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করা এবং ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করছে।

সম্প্রতি, ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জের যে মাদ্রাসায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হলো সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক, ১১টি সুইসাইডাল ভেস্ট উদ্ধার করা হয়েছে। ওই মাদ্রাসাটি জঙ্গি নেতা হারুন ইজাহারের শ্যালক আল আমিনের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। সেখানে দু'জন ভারতীয় মুসলমানের উপস্থিতির প্রমাণও পাওয়া গেছে। ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তান হাই কমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি (কালচারাল) আসগর স্বয়ং ওই মাদ্রাসায় জেহাদিদের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করেছেন বলেও তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সব কিছুর পেছনে আইএসআই এমন অভিযোগ করে তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানি সেনা গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই— যাদের কাজ সন্ত্রাস উৎপাদন, লালন ও রপ্তানি করা, তার ঢাকা সেল সম্প্রতি বাংলাদেশের জঙ্গিদের একটি বিশেষ গ্রুপ 'মুহাজির রেজিমেন্ট' গড়ে তুলেছে। এই রেজিমেন্টে পাকিস্তানি জঙ্গি সদস্যরা যুক্ত আছে।

এছাড়া বাংলাদেশে থাকা স্ট্র্যান্ডেড পাকিস্তানিরা এই রেজিমেন্টে কাজ করছে। এর বাইরেও রোহিঙ্গা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) এই মুহূর্তে প্রচণ্ডভাবে সক্রিয়। এই কম্বাইন্ড মুহাজির রেজিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে ঢাকাস্থ পাকিস্তানি হাই কমিশন বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন ভারতীয় স্থাপনা যথা ভারতীয় হাই কমিশন, ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র, ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার ইত্যাদিতে হামলার ছক কষছে। গত ১৮ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের খুলশীতে ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র এবং ডেপুটি হাই কমিশনারের বাসভবনে হামলার ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছে জঙ্গি নেতা হারুন ইজহার। এই হামলার ঘটনায় পাকিস্তানি নাগরিকের সরাসরি জড়িত থাকার প্রমাণও পাওয়া গেছে। হামলার পর পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করেছিল, ওইদিন গভীর রাতে হারুন ইজহার নিজে খুলশী থানায় গিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। সম্প্রতি ঢাকায় ওসমান হাদি হত্যার ঘটনাটি এই চক্রেরই সাজানো কাজ বলে ইতিমধ্যে সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করা এবং হাদি হত্যার দায় ভারতের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তারা ঘোলাজলে মাছ ধরতে চেয়েছিল। আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি হাদি হত্যার সঙ্গে জড়িতরা ঢাকাস্থ পাকিস্তানি হাই কমিশনেই আশ্রিত রয়েছে।

ভারত সরকার ও ভারতবাসীর কাছে আকুল আবেদন করে এই সনাতনী যোদ্ধা বলেন, এই পবিত্র ভারতভূমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভূমি, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভূমি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমি, সারদা মায়ের ভূমি। এই ভারতভূমির ওপর পৃথিবীর সকল হিন্দুর পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আত্মরক্ষার্থে আমি নিজে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছি। দয়া করে আমাদেরকে বাংলাদেশের অগ্নিকুণ্ডে পাঠিয়ে গণহত্যার মুখে ঠেলে দেবেন না।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা বলেন, আমরা বাংলাদেশের সব সনাতনী ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষাবলম্বনকারী শক্তির সঙ্গে রয়েছি। যেভাবেই হোক জেহাদিদের হাত থেকে রক্ষা করতে আমরা আপনাদের পাশে থাকব। ভারত সরকারও পাশে থাকবে।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশের মানুষের পাশে থাকার কথা বলেন অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতির রাজ্য সম্পাদক ব্রহ্মবিদ্যানন্দ মহারাজ, অল ইন্ডিয়া লিগাল এইড ফোরামের সম্পাদক সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, একাত্তরের যুদ্ধে বীরচক্র সম্মান পাওয়া ভারতীয় নৌবাহিনীর পূর্বতন কর্তা বিমলকুমার চন্দ এবং সনাতনী সংসদের সভাপতি গোবিন্দ দাস।



ধর্মনিরপেক্ষতা মানে নিজেদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা নয়, আত্মরক্ষার অধিকার ত্যাগ করা নয়। মানবতা মানে একচোখা নৈতিকতা নয়। ইতিহাস, পরিসংখ্যান ও রক্তাক্ত বর্তমান, সবকিছু মিলিয়ে আজ একটাই দাবি করে, সত্যকে স্বীকার করা।

বাংলাদেশে হিন্দু নিধন কি ঘুম ভাঙাবে এদেশের হিন্দুদের ?

দিগন্ত চক্রবর্তী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কণ্ঠে যে আর্তি আজও কানে বাজে—

'মোদের পিতৃপিতামহের চরণধূলি কোথায় রে?

সে আমাদের বাংলাদেশ, আমাদেরই বাংলা রে!'

তা কি কেবল নস্টালজিয়ার কবিতা হয়ে থাকবে? চণ্ডীদাস-রামপ্রসাদের বঙ্গে, যে বঙ্গ একদিন ভক্তি, মানবতা ও সহিষ্ণুতার প্রতীক ছিল, আজ সেই ভূখণ্ডেই হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব সংকটের মুখে। সময় যত এগোচ্ছে, পরিস্থিতি ততই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। ইতিহাসের পাতায় যে অগ্নিক্ষত আমরা পড়েছিলাম, আজ সেগুলো আর ইতিহাস নয়— চলমান বাস্তবতা।

১৯৪৬ সালের নোয়াখালিতে হিন্দু নরসংহার প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন, 'নোয়াখালির হিন্দুমেধ যজ্ঞ'। সেই শব্দবন্ধ আজ আর কেবল অতীতের জন্য প্রযোজ্য নয়। আজকের বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যে ক্রমাগত আক্রমণ, নির্যাতন, উচ্ছেদ ও হত্যার ঘটনা ঘটছে, তাকে যদি 'বাংলাদেশের হিন্দুমেধ যজ্ঞ' বলা হয়, তা মোটেই অতিরঞ্জন হবে না। বরং বলা যায়, ইতিহাস যেন নিজের পুনরাবৃত্তি করছে— আর পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা নির্বিকার দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। পরিসংখ্যানও এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে না। ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২২-২৩ শতাংশ যা আজ নেমে এসেছে সাত শতাংশের ঘরে। এই পতন কী স্বাভাবিক জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের ফল, নাকি ধারাবাহিক ভয়, নিপীড়ন, ভূমি দখল, ধর্মান্তর ও প্রাণনাশের ফল? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সবাই জানি। তবু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়াই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে।

অতি সম্প্রতি ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও জেহাদি ছাত্রনেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসা ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই হিংসার নিশানা যে বরাবরের মতো সংখ্যালঘু হিন্দুরাই, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ময়মনসিংহে আওয়ামি লিগ সমর্থক এক হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে গাছে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা যে কোনো সভ্য সমাজের শিউরে ওঠার জন্য যথেষ্ট। মেরে তার দেহ গাছে ঝুলিয়ে আগুন লাগানো হয়েছে— এই বর্ণনা কেবল নৃশংস নয়, মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্রতিচ্ছবি। এই ঘটনার সময়ে প্রশাসন কী করছিল এই প্রশ্ন করা অর্থহীন হলেও, একটা বিষয় সুস্পষ্ট, মাস্টারদা সূর্য সেন কিংবা প্রীতিলতার দেশে আজ বাঙ্গালি হিন্দুর অবস্থা কতটা শোচনীয়।

এখানেই আসে আরেকটি বেদনাদায়ক বাস্তবতা। প্রতিবেশী দেশে হিন্দু হত্যা হলে পশ্চিমবঙ্গের এক শ্রেণীর হিন্দু আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব থাকেন। তারা নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে পরিচয় দেন, মানবিকতার বড়াই করেন। গাজায় মানুষ মরলে তাঁদের মানবিকতা উথলে ওঠে, কিন্তু পাশের দেশে হিন্দুদের উপর সংঘটিত ভয়াবহ নৃশংসতা তাদের বিচলিত করে না। বাম আমলে এ রাজ্যে বানতলা, বিরাটি, কালিয়াচক, ক্যানিং

এই সব ঘটনাও চোখ থাকতেও তাঁরা দেখেননি। আজকের সন্দেশখালি বা মুর্শিদাবাদও তাঁদের চোখে পড়ে না। এই নীরবতা কোনো নিরপেক্ষতা নয়, বরং নির্বাচিত নৈতিকতার নগ্ন প্রকাশ। বাংলাদেশে হিন্দু হত্যা হলে তারা যেন অন্ধ হয়ে যান। অথচ শ্রীরামমন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা কোনো হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গেলেই তারা 'সাম্প্রদায়িকতা' দেখতে পান। তাঁদের এই দ্বিচারিতা আজ মানুষের কাছে স্পষ্ট।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সামনে এনে দেয়, তা হলো 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস্' বা 'বেঙ্গল ফাইলস্'-এর মতো সিনেমাগুলো কতটা বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরি। যারা এই ছবিগুলোকে 'প্রোপাগান্ডা' বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, আজ তাদের সামনে বাস্তব নিজেই প্রমাণ দিচ্ছে। একইসঙ্গে যারা প্রশ্ন করেন, কেন সিএএ-র মাধ্যমে শুধুমাত্র বাংলাদেশের হিন্দুদেরই আশ্রয় দেওয়া হবে, তাদের কাছেও আজ উত্তরটি স্পষ্ট হওয়া উচিত। যখন একটি দেশ তার সংখ্যালঘু নাগরিকদের জীবন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তখন আশ্রয় দেওয়া মানবিকতা নয়, বরং নৈতিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিংসার আঁচ এবার এসে লেগেছে তাদের সংবাদমাধ্যমের উপরেও। প্রথম আলো, ডেইলি স্টারের মতো প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমের অফিসে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ হয়েছে। খুলনায় এক সাংবাদিককে গুলি করে খুন করার খবরও সামনে এসেছে।। প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে বড়াই করে যারা এতদিন ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে 'নিপীড়িত' বলে ব্যঙ্গ করতেন, তারা আজ কী বলবেন? এই ঘটনাগুলো যেমন বাংলাদেশের কঠিন বাস্তবতাকে সামনে এনেছে, তেমনি প্রমাণ করেছে যে, কিছু সূচক, কিছু র‍্যাঙ্কিং কতটা কাগুজে ও বাস্তববিচ্ছিন্ন হতে পারে।

আর যারা মোগল স্থাপত্যকলা ও সংগীত নিয়ে গদগদ হয়ে যান, মনে করেন মোগলরা না এলে আমরা কিছুই জানতাম না, তাদের কাছেও আজ একটি প্রশ্ন তোলা জরুরি। কেন

আজ যখন পূর্ববঙ্গে মন্দির ভাঙা হয়, দেবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বাদ্যযন্ত্র পোড়ানো হয়, হিন্দুদের ধর্মপরিচয়ের কারণে জীবন্ত জ্বালিয়ে হত্যা করা হয়, তখন আর এটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। এটি একটি সুসংগঠিত মানসিকতা, যার লক্ষ্য কেবল হিন্দুদমন নয়, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নকরণ।

পুড়িয়ে দেওয়া হলো হারমোনিয়াম, বাদ্যযন্ত্র? কেন সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলোই প্রথম আক্রমণের শিকার হয়? কারণ সংস্কৃতি মানেই পরিচয়, আর পরিচয় ধ্বংস করা মানেই একটি দেশকে মেরুদণ্ডহীন করে দেওয়া। বাংলাদেশের ঘটনাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ঠাণ্ডা ঘরে বসে সেকুলারিজমের বুলি আওড়ানো আর বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

প্রশ্ন একটাই— পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কি এবারও শুধু কবিতা পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, নাকি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আর্তিকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক চেতনায় রূপ দেবে? এই প্রেক্ষিতেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে— প্রতিবেশী দেশের হিন্দুদের এই অস্তিত্ব সংকট দেখে এ রাজ্যের হিন্দু বাঙ্গালিরা কি কোনো শিক্ষা নেবেন? নাকি আজও তারা ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার ফাঁদে পড়ে নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারতে থাকবেন— সে উত্তর সময়ই দেবে। কিন্তু ইতিহাস বলে, বারবার উপেক্ষা করার মূল্য শেষপর্যন্ত অস্তিত্ব দিয়েই চুকাতে হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন, এই বাস্তবতার কথা আজ কেউ নতুন করে বলছে না। বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'Pakistan or the Partition of India'-তে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন— 'The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is brotherhood of Muslims and for Muslims only.'

এই বক্তব্য কোনো বিদ্বেষ থেকে নয়, বরং তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ। আজকের বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের পরিস্থিতির দিকে তাকালে ড. আম্বেদকরের এই পর্যবেক্ষণ কতটা প্রাসঙ্গিক তা বোঝা যায়।

একইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা আজ নতুন করে ফিরে আসে— 'পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র— সে হচ্ছে খ্রিস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এই জন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই।'

রবীন্দ্রনাথের এই কথাকে দীর্ঘদিন ধরে 'অস্বস্তিকর সত্য' বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ঘটনাপ্রবাহ যেন বহু দশক আগের এই পর্যবেক্ষণের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আজ যখন পূর্ববঙ্গে মন্দির ভাঙা হয়, দেবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বাদ্যযন্ত্র পোড়ানো হয়, হিন্দুদের ধর্মপরিচয়ের কারণে জীবন্ত জ্বালিয়ে হত্যা করা হয়, তখন আর এটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। এটি একটি সুসংগঠিত মানসিকতা, যার লক্ষ্য কেবল হিন্দুদমন নয়, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নকরণ।

তাই আজ সময় এসেছে বামেদের তৈরি করা ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণ ভেঙে বাস্তবের সম্মুখীন হবার। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে নিজেদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা নয়, আত্মরক্ষার অধিকার ত্যাগ করা নয়। মানবতা মানে একচোখা নৈতিকতা নয়। ইতিহাস, পরিসংখ্যান ও রক্তাক্ত বর্তমান, সবকিছু মিলিয়ে আজ একটাই দাবি করে, সত্যকে স্বীকার করা। নচেৎ, ভবিষ্যতের কোনো এক দিনে হয়তো আবার কেউ প্রশ্ন করবে— 'মোদের পিতৃপিতামহের চরণধূলি কোথায় রে?' কিন্তু তখন আর উত্তর দেওয়ার মতো কেউ আর থাকবে না। □

‘বাংলাকে গুজরাট হতে দেব না’

চাইলেও গুজরাট হতে পারবেন কি?

সোমনাথ গোস্বামী

ছাব্বিশ জানুয়ারি, ২০০১। সাধারণতন্ত্র দিবসের সকালে গুজরাট কেঁপে উঠেছিল এক ভয়ংকর ভূমিকম্পে— রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল প্রায় ৭.৭। ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির নিরিখে এই বিপর্যয় স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী প্রায় কুড়ি হাজার মানুষের মৃত্যু, লক্ষাধিক মানুষ আহত এবং চার লক্ষেরও বেশি বাড়িঘর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়। কচ্ছ জেলার ভুজ, আনজার ও ভাচাউ এলাকার বিস্তীর্ণ অংশ কার্যত বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। শুধু মানুষের জীবন নয়, ভেঙে পড়ে রাজ্যের উৎপাদন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগ, সড়ক যোগাযোগ এবং প্রশাসনিক কাঠামো। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বললে, গুজরাটের কার্যক্ষমতা এক ধাক্কায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই গুজরাটের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যাত্রার এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ২০০১ সালের শেষভাগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সামনে তখন কোনো উন্নয়নের নকশা প্রস্তুত ছিল না— ছিল একটি ভেঙে পড়া রাজ্য এবং সেই ভাঙন থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ। ভূমিকম্পের পর রাজ্য সরকার প্রথম যে মৌলিক পরিবর্তনটি করে, তা হলো সরকারি খরচের অগ্রাধিকার বদলানো। দৈনন্দিন প্রশাসনিক ব্যয়ের বদলে গুরুত্ব দেওয়া হয় স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে— যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিল্প স্থাপনের উপযোগী জমি এবং পণ্য পরিবহণের নির্ভরযোগ্য স্থায়ী ব্যবস্থা তৈরির উপর জোর দেওয়া হয়।

রাজ্যজুড়ে নতুন পাকা সড়ক তৈরি হয়, পুরনো পথ চওড়া করা হয় এবং শিল্পাঞ্চলগুলিকে বন্দর ও শহরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি সঞ্চালন ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়, যাতে বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য কারখানার কাজ থেমে না যায়। সুস্পষ্ট শিল্প নীতি গ্রহণ করা হয় যেখানে দেশের মধ্যে প্রথম Industry based Cluster অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট এলাকাকে চিহ্নিত করে সেখানে সেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিকাঠামো নির্মাণ করা হয় এবং শিল্পকে আধিকারিকস্তরে লাল ফিতের ফাঁস মুক্ত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে একাধিকবার, কিন্তু উন্নয়নের ধারাবাহিকতা তৈরি হয়নি। কোথাও সংঘাত, কোথাও অনিশ্চয়তা, কোথাও দানখয়রাতির রাজনীতি— সব মিলিয়ে রাজ্যটি জাতীয় মঞ্চে ধীরে ধীরে শেষ প্রান্তে সরে গেছে।

এর প্রভাব খুব দ্রুত সংখ্যায় ধরা পড়তে শুরু করে। ২০০১- ২০০২ সালে গুজরাটের nominal GSDP ছিল আনুমানিক দুই লক্ষ কোটি টাকার আশেপাশে। পরবর্তী প্রায় আড়াই দশকে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে তা বেড়ে আজ প্রায় ত্রিশ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছেছে। একই সময়ে জাতীয় উৎপাদনে রাজ্যের অংশ ধীরে ধীরে বেড়ে সাড়ে আট শতাংশের আশেপাশে স্থিত হয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো এই বৃদ্ধির ধরন— ভারতের শিল্প উৎপাদনে গুজরাটের অংশ ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে আজ ত্রিশ শতাংশের অনেক উপরে, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় স্পষ্টভাবেই বেশি।

বন্দরনির্ভর শিল্পায়ন গুজরাটের এই উত্থানের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। কাণ্ডলা (বর্তমানে দীনদয়াল), মুন্দ্রা, পিপাভাবের মতো সরকারি ও বেসরকারি বন্দর মিলিয়ে গুজরাটে আজ চল্লিশটির বেশি ছোটো বড়ো কার্যকর বন্দর রয়েছে। দেশের মোট পণ্য পরিবহণের প্রায় চল্লিশ শতাংশ একাই গুজরাট সামলায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিমান যোগাযোগ— ন'টির বেশি পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক বিমানবন্দর রাজ্যের শিল্প ও পরিষেবা অর্থনীতিকে দেশের ভিতর ও বাইরের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

শিক্ষা ও মানবসম্পদ ক্ষেত্রেও একই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে শুধু সংখ্যায়

নয়, শিল্পের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। তারই ফল আজ গুজরাটে ইপিএফও-র আওতায় নথিভুক্ত আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান দেড় কোটির কাছাকাছি। একাধিক বছরের গড় ধরলে রাজ্যের বেকারত্বের হার তিন শতাংশের আশেপাশে— দেশের মধ্যে সর্বনিম্নগুলির একটি। মাথাপিছু আয় যেখানে আড়াই দশক আগে পঁচিশ হাজার টাকার কাছাকাছি ছিল, আজ তা তিন লক্ষ টাকার গণ্ডি অতিক্রম করেছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নরেন্দ্র মোদী যে উন্নয়নের ভিত গুজরাটে স্থাপন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারী মুখ্যমন্ত্রীরা তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদীর পর আনন্দীবেন প্যাটেল, বিজয় রূপানি এবং বর্তমানে ভূপেন্দ্র প্যাটেল— মুখ্যমন্ত্রী বদলেছে, কিন্তু উন্নয়নের দিশা বদলায়নি। গত আড়াই দশকে বিজেপি শাসনে গুজরাটে উন্নয়ন ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।

এই একই সময়ে দেশের পূর্ব প্রান্তে পশ্চিমবঙ্গও এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ছিল। দীর্ঘ বাম শাসনের শেষের দিকে জ্যোতি বসু রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর হাতে। শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক ও শিল্পবান্ধব বলে কথিত এই মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে অনেকেই রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের প্রত্যাশা করেছিলেন। তাঁর আমলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ গড়ে ওঠে, কিছু আইটি সংস্থা রাজ্যে আসে এবং রাজ্য সীমিত হলেও নতুন ধরনের কর্মসংস্থানের স্বাদ পায়। বন্ধ হওয়া শিল্প পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়, বড়ো শিল্পের জন্য জমি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো রোডম্যাপ ছিল না বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাতে। বড়ো শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে তার সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতিতে প্রকাশ্যে আসে তার স্বৈরাচার।

এছাড়া বামপন্থী রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে পড়ে শিল্পহীন। দেনার দায়ে ডুবতে থাকে রাজ্য।

২০০১-২০০২ থেকে ২০১০-২০১১ এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের nominal GSDP দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেলেও এই উদ্যোগগুলি সমাজ ও রাজনীতির স্তরে স্থায়ী সমর্থন পায়নি। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম— এই দুই ঘটনায় শিল্পায়নের প্রশ্ন রাজ্যে উন্নয়নের ভাষা থেকে সংঘাতের ভাষায় বদলে যায়। বিনিয়োগকারীদের কাছে বার্তাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে— এই রাজ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন, আর বাস্তবায়ন আরও কঠিন।

এই প্রেক্ষাপটেই ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আসে আর এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল জনসমর্থনে ক্ষমতায় আসে। এটি ছিল দীর্ঘদিনের বাম শাসনের বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভের রাজনৈতিক বিস্ফোরণ। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন সরকারের অগ্রাধিকার ছিল ভিন্ন। শিল্প ও উৎপাদনের বদলে রাজ্যের মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে সরাসরি দান-খয়রাতির রাজনীতি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী— এই প্রকল্পগুলি তাৎক্ষণিক স্বস্তি দিলেও রাজ্যের উৎপাদনভিত্তি মজবুত করতে পারেনি।

পরবর্তী এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই ধারা অব্যাহত থাকে। পশ্চিমবঙ্গের nominal GSDP বেড়ে আজ আঠারো-উনিশ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে ঠিকই, কিন্তু জাতীয় উৎপাদনে রাজ্যের অংশ নেমে এসেছে ছয় শতাংশের নীচে। মাথাপিছু আয় দেড় লক্ষ টাকার আশেপাশে— জাতীয় গড়ের তুলনায় পিছিয়ে। শিল্প উৎপাদনের অংশ ষোলো থেকে আঠারো শতাংশের মধ্যেই আটকে রয়েছে। ইপিএফও-র আওতায় নথিভুক্ত কর্মসংস্থান সীমিত এবং একাধিক বছরের গড় ধরলে বেকারত্বের হার সাত শতাংশের কাছাকাছি।

পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও এই পিছিয়ে পড়া স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে এখন কার্যত মাত্র দু'টি পূর্ণাঙ্গ অপারেশনাল বাণিজ্যিক বিমানবন্দর— কলকাতা ও বাগডোগরা। বন্দর ব্যবস্থা একটি মাত্র নদীবন্দরনির্ভর কাঠামোতেই আটকে। শিল্প কারখানার সংখ্যা দীর্ঘদিন ধরে স্থবির। সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ আজ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম বৃহৎ শ্রম রপ্তানিকারক রাজ্যে পরিণত হয়েছে। কাজের খোঁজে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী রাজ্যের বাইরে পাড়ি দিচ্ছেন। ডিপার্টমেন্ট ফর প্রোমোশন অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড থেকে প্রকাশিত তথ্যঅনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে রাজ্যে ৬,৬৮৮টি বড়ো-ছোটো-মাঝারি শিল্প ইউনিট বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

প্রায় আড়াই দশকের এই তুলনা একটি নির্মম সত্য সামনে আনে। গুজরাটে বিজেপি শাসনে উন্নয়ন হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন— নেতৃত্ব বদলালেও দিশা বদলায়নি। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে একাধিকবার, কিন্তু উন্নয়নের ধারাবাহিকতা তৈরি হয়নি। কোথাও সংঘাত, কোথাও অনিশ্চয়তা, কোথাও দানখয়রাতির রাজনীতি— সব মিলিয়ে রাজ্যটি জাতীয় মঞ্চে ধীরে ধীরে শেষ প্রান্তে সরে গেছে।

একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিধ্বস্ত একটা রাজ্য এক দশকের মধ্যে দেশের প্রথম সারির রাজ্য হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেছে, আর অন্যদিকে একটা শিল্প বাণিজ্য ও মেধার মিলনস্থল বলে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ নীতিহীনতা ও দুর্নীতিতে দেশের অর্থনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে। তাই যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী-সহ বাম, তৃণমূল ও তাদের পোষিত বুদ্ধিজীবীরা বলেন 'পশ্চিমবঙ্গকে গুজরাট হতে দেব না' অজান্তে ভাগ্যবিধাতা হয়তো বলে উঠেন চাইলেও আপনারা কি আর পশ্চিমবঙ্গকে গুজরাট বানাতে পারবেন? □

সংবিধানের ৩০ নং ধারা বাতিল করা উচিত

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর হিন্দুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বহু উদাহরণ আছে। তার মধ্যে একটি হলো সংবিধানে ৩০ নং ধারার সংযোজন। এই ৩০ নং ধারা হলো একটি হিন্দু বিরোধী আইন যা নেহরু অন্যায়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি যখন এই অনুচ্ছেদটি অন্যায়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন তখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন যে, এই আইন হিন্দুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা; যদি এই আইন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তিনি মন্ত্রীসভা ও কংগ্রেস উভয় থেকেই পদত্যাগ করবেন।

চাপে পড়ে নেহরু সাময়িকভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সর্দার বল্লভভাইয়ের মৃত্যুর পর নেহরু অবিলম্বে অনুচ্ছেদটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন।

এই ৩০নং ধারার মধ্যে কী রয়েছে তা অধিকাংশ দেশবাসীর জানা নেই। এই আইন অনুসারে কোনো স্কুল-কলেজে সনাতন ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে, মুসলমান ও খ্রিস্টানরা তাদের মজহব ও রিলিজিয়ন প্রচারের জন্য মাদ্রাসা ও কনভেন্ট স্কুল চালাতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা তা করলে এই আইনের বলে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

তাছাড়া, মসজিদ ও গির্জার দানের টাকাপয়সা ও সোনাদানার অধিকার একমাত্র তাদেরই। সেই অর্থ তারা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু সরকার কোনো হিন্দু মন্দিরের দানের অর্থ ও সোনাদানার অধিকার সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। নেহরু এসব করেছিলেন যাতে মুসলমান ও খ্রিস্টানরা খুব সহজেই হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতে পারে।

তাই একথা বলা যেতেই পারে যে, ভারতীয় সংবিধানে ৩০নং ধারা প্রণয়ন নেহরুর হিন্দুদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত বিশ্বাসঘাতকতা। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই বৈষম্যমূলক ৩০নং ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে কোটি কোটি হিন্দুর তাতে সমর্থন থাকবে একথা বলাই বাহুল্য।

কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য,
কৈলাস বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬।

গোহত্যা বন্ধে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন আবশ্যক

ভারত কোনো কসাইখানা নয়— ভারত এক সভ্যতার নাম। যে সভ্যতার মূলে রয়েছে কৃষি, প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং সর্বজীবে করুণা প্রদর্শন। ভারত সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই গোজাতি ছিল সম্পদ— অর্থনীতির চালিকাশক্তি, কৃষকের ভরসা। ছিল আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। আজ যখন সেই গোবংশকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়, তখন তা কেবল একটি প্রাণহানি নয়, তা ভারতাত্মায় আঘাতের নামান্তর।

ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে গোবংশ 'গোমাতা' বলে পূজিত। তারা দুধ দেয়, ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে, জৈবকৃষির ভিত্তি রচনা করে। গোসম্পদ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির অর্থ হলো পরিবেশের ভারসাম্য, মানে সহনশীলতার শিক্ষা। তাই গোবংশকে নির্বিচারে হত্যা মানে প্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে প্রতারণা।

এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যাকে পূজা করে, তাকে কখনোই অন্যের ভোজ্যসামগ্রী হতে দেওয়া যায় না। ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থ কখনোই অন্যের আস্থা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে পদদলিত করা নয়। সংবিধানে সকলের অধিকার রক্ষার কথা থাকলেও তা অন্যের বিশ্বাস, আস্থা ধ্বংস করার লাইসেন্স নয়। আজ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আলাদা আইন, আলাদা ব্যাখ্যা— ফলে গোরুপাচার, অবৈধ কসাইখানা মাথাচাড়া দিচ্ছে। এই বিশৃঙ্খলা বন্ধ করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে সর্বভারতীয় স্তরে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। এমন আইন যাতে সম্পূর্ণভাবে গোহত্যা বন্ধ হবে, গোরুপাচার বন্ধ হবে। সেই সঙ্গে গোরক্ষার নামে কোনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না, সর্বত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

গোরক্ষার প্রশ্নে কোনো দ্বিচারিতা থাকবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে রপ্তানি-লাভ, ভোটব্যাংকের নামে নীরবতা— এসব মেনে নেওয়া যায় না। ভারতীয় সংস্কৃতি কোনো আপোশের পণ্য নয়। যে দেশে গোমাতা পূজিত হন, সেদেশে গোমাতার রক্ত বইতে পারে না। আজ সময় এসেছে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার। আসুন, গোহত্যা বন্ধে কেন্দ্রীয় আইন আনার জন্য সরব হন. হিন্দু সংস্কৃতি বাঁচান, প্রকৃতি বাঁচান, ভারতাত্মাকে বাঁচানোর শপথ গ্রহণ করুন।

কুন্তল চক্রবর্তী,
খয়রামারী, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা।

ইসলামে কেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অভাব?

৭১২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইসলামি আগ্রাসনের শুরু। তারপর থেকে কয়েক শতাব্দী তারা তাণ্ডব চালিয়েছে ভারতের বুকে। কত মঠ-মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা ধ্বংস করেছে। এদেশে তারা শাসন করেছে। নবাব-বাদশার মদতে এদেশের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে বিধর্মী করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ধর্মান্তরিতরা সবসময় আরব দস্যুদেরই সাথ দিয়েছে। ইসলামি শাসন সমাপ্ত হবার পর ওই নব্য মুসলমানরাই এদেশের হিন্দুদের উপর আক্রমণ করেছে, হিন্দু নারীদের সম্মানহানি করেছে। ইসলামি শাসন বিদায় হবার পর ওই নব্য মুসলমানরা আবার তাদের স্বধর্মে ফিরে না এসে এই দেশকে দার-উল-হার্ব থেকে দার-উল ইসলামে পরিণত করার চেষ্টায় মেতে রয়েছে। মনে প্রশ্ন জাগে, মুসলমানদের মধ্যে কেন স্বাভিমানবোধ জাগ্রত হয় না। কেন তারা ভাবে না যে, কয়েক পুরুষ আগে তারা হিন্দুই ছিল। তরবারির মুখে তারা প্রাণের ভয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, আজ তো সেই ভয় নেই, তবু কেন তারা স্বধর্মে ফিরে না এসে আরব মরুদস্যুদের সংস্কৃতিকেই আঁকড়ে বসে আছে? তাদের মধ্যে কি মুক্তমনা, স্বাভিমানী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ জন্মগ্রহণ করছে না? এর কারণ মুসলমানদেরই অনুসন্ধান করতে হবে।

শ্রীধর মাহাত,
হুটমুড়া, পুরুলিয়া।

ফ ঃ ৩

শাসক দল আড়াল করলেও অনুপ্রবেশকারী দখলমুক্ত হবেই পশ্চিমবঙ্গ

প্রদীপ মারিক

অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে ব্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতের সুদর্শনচক্র দেখতে পাননি। কারণ এমন কথা শোনা যাচ্ছে যে, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ফলে নাকি প্রায় এককোটি নাম বাদ পড়তে পারে। এত ভুয়ো ভোটার বাদ পড়লে তো মাথা হ্যাং হয়ে যাওয়ারই কথা।



এদিকে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অনুপ্রবেশকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা তাড়াতাড়ি রাজ্য ছাড়ো। এর আগে তাঁর হুঁশিয়ারিতে নিউ মার্কেট ফাঁকা করে অনেক অনুপ্রবেশকারী পালিয়েছে। তিনি বলেছেন,'আগামী কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে যেতে হবে। যে পথ দিয়ে ঢুকেছেন, যেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই, ওই ফাঁকা পথ দিয়েই বেরিয়ে যান।'

পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের আশ্রিত অনুপ্রবেশকারীদের কাছে কোনো নথিপত্র নেই। তাদের পুশব্যাক করবে বিএসএফ। একটি সূত্র অনুযায়ী, সীমান্তে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ট্রাক তৈরি রয়েছে। এইসব ট্রাকে করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যাওয়া হবে সোনাই নদীর তীরে। সেখান থেকে নাকি বিজিবি-র বোটে করে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে বাংলাদেশে। এর আগে বিভিন্ন জায়গায় অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল বিএসএফ-কে। অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে ক্রমাগত বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ধরে ধরে পুশব্যাক করছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। এ নিয়ে প্রথমদিকে আপত্তি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে বড়ো রকমের বিরোধিতা আসেনি সীমান্তের ওপার থেকে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু হতেই মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা ভারত ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে। সম্প্রতি কলকাতা সফরে এসে অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শা। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীরা অনেকদিন ধরেই ভারতে ঢুকছে। কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময় তারা অসম সীমান্ত দিয়ে ঢুকত। এখন ওরা পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে, যেখানে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদি তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারকে সরিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আনতে পারেন, তাহলে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ সমস্যা এবং সীমান্ত এলাকায় সবরকমের অপরাধ বন্ধ হবে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ এবং সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানো নিয়ে চাপান-উতোর নতুন কথা নয়। গত এগারো-বারো বছরে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত ভারত সরকারের সময়কালে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকবার অভিযোগ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসহযোগিতার কারণেই ভারতীয় ভূখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া বসাতে গিয়ে প্রবল সমস্যায় পড়েছেন সরকারি কর্মীরা। এবারও এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে সোচ্চার হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ সীমান্তে এমন ২৫০ কিলোমিটার জায়গা আছে যেখানে কাঁটাতারের বেড়া লাগানো সম্ভব নয়। সেখানে খরস্রোতা নদী আছে, ভৌগোলিক অবস্থানও খুব একটা অনুকূল নয়। এর বাইরে ৪০০ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় জমি দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। এর আগেও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে আনা ফরেনার্স বিল নিয়ে আলোচনার সময়ও সংসদে দাঁড়িয়ে একই অভিযোগ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। ভোটব্যাংকের লোভে যারা অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দেয়. এবার তাদের যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গবাসী। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যতই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে কটাক্ষ করুন না কেন, তাঁর হাতের সুদর্শনচক্র যে প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে ফেরত পাঠাবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। □



সাবধান !

নারী শিকারিদের জালে মেয়েরা

অরুণা রায় চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গে নারীপাচার কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি জেলায় জেলায় ছড়িয়ে থাকা একটি কাঠামোগত সমস্যা— যার শিকড় দারিদ্র্য, দুর্যোগ ও প্রশাসনিক শৈথিল্যে প্রোথিত। পরিসংখ্যানের আড়ালে যে বাস্তবতা লুকিয়ে আছে, তা বুঝতে হলে জেলার নাম ধরে সমীক্ষা প্রয়োজন।

উত্তর ২৪ পরগনা দীর্ঘদিন ধরেই নারী ও শিশু পাচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সংবেদনশীল জেলা হিসেবে চিহ্নিত। বসিরহাট, বাদুড়িয়া, হিঙ্গলগঞ্জ, স্বরূপনগর— এই সীমান্তবর্তী ব্লকগুলি থেকে বহু কিশোরী নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ২০২২ সালে বসিরহাট মহকুমায় একাধিক নাবালিকা নিখোঁজের ঘটনা সামনে আসে, যাদের অনেককেই পরে তিন রাজ্যে উদ্ধার করা হয়। তদন্তে উঠে আসে, কাজ ও বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দালালরা সীমান্ত পেরিয়ে পাচার করেছিল। প্রশ্ন উঠেছে, সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত নজরদারি থাকা সত্ত্বেও এই ঘটনা কীভাবে ঘটল?

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও সুন্দরবনে আমফান (২০২০) ও ইয়াস (২০২১)-এর পর গোসাবা, ক্যানিং, পাথরপ্রতিমা ও কাকদ্বীপ এলাকায় নারীপাচারের অভিযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বহু পরিবারের সর্বস্বান্ত হওয়ার সুযোগ নিয়েছে পাচারকারীরা। ২০২১ সালে ক্যানিং মহকুমা থেকে একাধিক তরুণীকে মুম্বইয়ে কাজের নাম করে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে জানা যায়, তারা যৌন শোষণের শিকার হয়। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ ছিল, দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের অভাবেই তারা ফাঁদে পা দিয়েছিল।

মালদা ও মুর্শিদাবাদে নারীপাচারের একটি বড়ো পদ্ধতি হলো ভুয়ো বিয়ে। ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে মালদার কালিয়াচক- বৈষ্ণবনগর এলাকার একাধিক ঘটনা সামনে আসে, যেখানে তরুণীদের অন্য রাজ্যে বিয়ে দিয়ে বিক্রি করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ ও সামশেরগঞ্জ থেকেও একই ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, কারণ বহু ক্ষেত্রেই স্থানীয়ভাবে আগেই সন্দেহের ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, তেহট্ট ও চাপড়া এলাকায় প্রতিবছরই কিশোরী নিখোঁজের ঘটনা সামনে আসে। ২০২২ সালে নদীয়া জেলা পুলিশ স্বীকার করে যে নিখোঁজের একটি বড়ো অংশ আন্তঃরাজ্য পাচারকারীদের কবলে পড়েছে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, নিখোঁজের রিপোর্ট দ্রুত এফআইআর-এ রূপান্তর না হলে তদন্ত শুরু হবে কীভাবে?

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার চা-বাগান এলাকাগুলিতে দীর্ঘদিন ধরেই পাচারচক্র সক্রিয়। ২০১৪ সাল থেকেই একাধিক রিপোর্টে উঠে এসেছে, চা শ্রমিক পরিবারের মেয়েদের ভিন রাজ্যে গৃহকর্মীর নামে পাচার করা হয়েছে। ২০২৩ সালে জলপাইগুড়িতে উদ্ধার হওয়া কয়েকজন তরুণী জানান, তাদের দিল্লি ও হরিয়ানায় কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, পরে আটকে রাখা হয়েছিল। নারী সুরক্ষার আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগে ঘাটতি। রাজ্য সরকার বারবার Anti Human Trafficking Unit (AHTU), CID সেল এবং Child Rights Directorate-এর কথা বললেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। অনেক জেলায়— AHTU জনবলের অভাবে ভুগছে, প্রশিক্ষিত তদন্তকারীর অভাব, আন্তঃরাজ্য সমন্বয় ধীরগতির।

ফলে পাচারচক্র ভাঙার বদলে কেবল বিচ্ছিন্ন উদ্ধারেই প্রশাসন সীমাবদ্ধ থাকছে। রয়েছে পরিসংখ্যানের আড়ালে দায় এড়ানোর প্রবণতা। সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো, নারী পাচারের বহু ঘটনাকে এখনো 'নিখোঁজ' বা 'অপহরণ' হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়। এতে রাজ্যের পাচার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তুলনামূলক কম দেখায়, কিন্তু বাস্তবতা বদলায় না। এখানেই রাজ্য সরকারের দায় সবচেয়ে বেশি। কারণ তথ্য লুকোলে সমস্যার সমাধান হয় না।

পরিশেষে বলতে হয়, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে সুন্দরবন; মালদা থেকে জলপাইগুড়ি— পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র জুড়ে নারীপাচার চক্র সক্রিয়। এটা কেবল সামাজিক সমস্যা নয়, এটি শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রতিফলন। রাজ্য সরকার যদি এখনো বিষয়টিকে অগ্রাধিকার না দেয়, তবে আগামীদিনে নিখোঁজের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এর প্রতিকারে সর্বাগ্রে নারীসমাজকেই সচেতন হতে হবে। □

নিয়ম মেনে চললে গাউটের সমস্যাকেও নিয়ন্ত্রণে আনা যায়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

গাউট নামটির সঙ্গে অনেকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। এটি এক ধরনের আর্থ্রাইটিস, যার ফলে অস্থিসন্ধিতে প্রদাহ হয়। একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, ১৯৯০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে গাউট রোগীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে।



'আর্থ্রাইটিস অ্যান্ড রিউম্যাটোলজি' সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১৭ সালে সমগ্র বিশ্বে ৪১.২ মিলিয়ন গাউটের কেস নথিভুক্ত হয়েছে। প্রতি ১ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৯২টি নতুন কেস আসছে। অতিরিক্ত বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) ও কিডনির সমস্যা গাউট রোগটিকে ত্বরান্বিত করছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

কেন হয় গাউট?

গাউট হওয়ার প্রধান কারণ হলো রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়া। এছাড়া কোনো কারণে শরীরে জলশূন্যতা হয়ে ডিহাইড্রেশন হলে কিংবা মেটাবলিক ডিজঅর্ডার থাকলে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গিয়ে সেখান থেকেও গাউটের সমস্যা হতে পারে।

এছাড়াও কিডনি ও থাইরয়েডের সমস্যা বা শরীরে দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনো ক্রনিক ডিজঅর্ডার গাউটকে ত্বরান্বিত করে। মধ্যবয়সি পুরুষ এবং মেনোপোজ পরবর্তী সময়ে মহিলাদের মধ্যে এই রোগের আধিক্য দেখা যায়।

পরিবারে মা, বাবা বা ভাই-বোনের কারও গাউট হলেও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

পিউরিন জাতীয় খাবার খুব বেশি খেলে, যেমন রেডমিট, মেটে, সার্ডিন মাছ, অ্যাসপারাগাস, ফুলকপি, বিনস, মাশরুম গাউটের ঝুঁকিকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানও এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা

গাউট প্রথমে ক্লিনিক্যালি দেখে চিকিৎসকরা নির্ণয় নেন। এর পরে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা এবং বেশ কয়েকটি রক্তপরীক্ষা ও আক্রান্ত স্থানের এক্স-রে করিয়ে দেখা হয়। ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকলে তার জন্য ওষুধ দেওয়া হয়, যা সারাজীবন খেয়ে যেতে হয়। আর ব্যথা কমানোর জন্য নন স্টেরয়ডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

গাউট ও ডায়েট

গাউটের সঙ্গে ডায়েটের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। কী খাবেন আর কী কী খাবেন না, রোগটির হাত থেকে মুক্তি পেতে তার একটি গাইড লাইন হলো—

(১) অতিরিক্ত চিনি খাওয়া কমাতে হবে। অতিরিক্ত চিনি বাড়িয়ে দেয় ডায়াবেটিসের ঝুঁকিকে। এর ফলে শরীরে ইনসুলিন ঠিকমতো কাজ করতে পারে না, অতিরিক্ত শর্করা রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পারিমাণ বাড়িয়ে দেয়। গবেষকরা বলছেন, ৯৫ শতাংশ মানুষ যাদের গাউটের সমস্যা আছে তাদের হাইপার ইনসুলিনেমিয়া আছে। শরীরে সুগার লেভেল বেড়ে গেলে অন্ত্রে খারাপ ব্যাকটিরিয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। এগুলি ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়ে দিয়ে গাউটের সমস্যাকেও বাড়িয়ে দেয়।

(২) অতিরিক্ত ফ্রুক্টোজ বাদ দিতে হবে। বাজারে যেসব মিষ্টি পানীয় বা টেট্রাপ্যাকের জুস পাওয়া যায় তাতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিকর ফ্রুক্টোজ থাকে, এটিও প্রত্যক্ষভাবে শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের বাড়ানোর জন্য দায়ী। কাজেই এই ধরনের খাবার বন্ধ করতে হবে।

(৩) অ্যালকোহল একেবারেই বন্ধ। এক্ষেত্রে তৃতীয় যে নামটি আসবে তা হলো অ্যালকোহল। অতিরিক্ত মদ্যপানে শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের উৎপাদনশীলতা বেড়ে যায়। যাদের ইউরিক অ্যাসিড বেশি, এখনোও গাউটের সমস্যা দেখা দেয়নি, তাদেরও এবিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

(৪) মধ্যমাত্রার প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব ব্যক্তি গাউটের সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের মধ্যমাত্রার প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত। প্রতিদিনের ডায়েটে অল্প অল্প করে প্রোটিন গ্রহণ করলে গাউট নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে তার সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, প্রোটিন ইনটেক খুব বেড়ে গেলে মানে খুব বেশি পালংশাক, মসুরডাল, পনির খেলে গাউটের সমস্য মাত্রাছাড়াভাবে বাড়তে থাকে।

(৫) পর্যাপ্ত জল পান করতে হবে। গাউটের রোগীর বা রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা যাদের বর্ডার লাইনে আছে তাদের বেশি জল পান করা প্রয়োজন। নাহলে শরীরের অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড থেকে কিডনিতে পাথর তৈরি হতে পারে।

(৬) ভিটামিন সি। খাবারে সাপ্লিমেন্টের মাধ্যমে শরীরে ভিটামিন সি পৌঁছানো দরকার। শরীরের টক্সিনকে দ্রুত ছেঁকে শরীরের বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করে ভিটামিন সি। □


জ্বলছে ছায়ানট

শতবর্ষে বিধ্বস্ত ছায়ানট
বঙ্গ সংস্কৃতির ছায়াহীন আজ বাংলাদেশ

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

কিছু কিছু শব্দে বাঙ্গালি পায় আহ্বান, পায় শান্তির সন্ধান, দেখতে পায় বোধোদয়ের পথ। শব্দগুলিতে মানুষ খুঁজে পায় তার পরিপূর্ণতার পথ, স্বাতন্ত্র্যের আভিজাত্য। রাজনৈতিক ভাবে দু'টি দেশ ভিন্ন হতে পারে, থাকতে পারে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস এবং অনেক অনির্ণীত পররাষ্ট্রনীতি। কিন্তু কৃত্রিম রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যখন একটি দেশ বিভাজিত হয়, তখন দেশভাগের পরও কিন্তু জাতির প্রশ্ন ওঠে। এছাড়াও উঠে আসে 'এথনিক কালচার' নামক একটি শব্দবন্ধ। তখন মনে হয় ভারত ভেঙে পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ হওয়ার পরও এপার আর ওপার বঙ্গে এখনও যেটুকু যোগ বা সাংস্কৃতিক লেন-দেন রয়েছে, যে কৃষ্টি ও পরম্পরার টান রয়েছে, তার মূল্য অনেক। 'ছায়ানট' এমনই একটি শব্দ, কিন্তু তা যেন রেখে যায় বাঙ্গালিয়ানার স্বাক্ষর। 'ছায়ানট' হলো বিশ্বের সব বাঙ্গালি, সব বঙ্গ সংস্কৃতিপ্রেমীদের কাছে প্রণম্য একটি শব্দ। যদি সাগরপারে দাঁড়িয়েও কোনো বাঙ্গালি সংবাদ পান যে ছায়ানটে মেঘের ঘন অন্ধকার ছায়া আছড়ে পড়েছে, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ যেন কাতর হয়ে উঠবেন। নির্দ্বিধায় জানাবেন প্রতিবাদ। কারণ তা হলো বাঙ্গালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত। এই প্রলয়ের আবির্ভাব যেন তুমুল অবক্ষয়ের অশনি সংকেত! এই বিষণ্ণ সংক্রান্তির আবির্ভাবের কারণেই আজ এই নিবন্ধের অবতারণা।

ছায়ানটের ওপর নেমে আসা আক্রমণের প্রসঙ্গে বলতে হয় গত ৭৮ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ জুড়ে সীমাহীন হিন্দু নির্যাতনের কথা। ওপার বঙ্গে মোল্লাবাদের চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য, হিন্দুদের ওপর নির্মম, নিষ্ঠুর আচরণ, অকথ্য অত্যাচার, রাস্তায় ধরে ধরে হিন্দু হত্যা, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে হত্যা এবং জামাতিদের মর্জিমাফিক দেশ পরিচালনা হলো ১৯৭১-পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। মহম্মদ ইউনুসের


ভস্মীভূত ছায়ানটের অন্দরমহল


হারমোনিয়াম নিয়ে চম্পট লুম্পেনরা

‘ছায়ানট’ আগামীকাল কলম ধরে প্রতিবাদমুখর হতে পারে, প্রতিবাদী সুর বাঁধতে পারে। তাই এই প্রতিবাদী কণ্ঠকে অবরুদ্ধ করো। তাদের শব্দ প্রয়োগ, ভাষা চর্চায় পাঁচিল তোলো। কারারুদ্ধ করো যুক্তিকে।

নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হলো পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালি সংস্কৃতির বুকে শেষ পেরেক! আত্মহনন করছে বর্তমান বাংলাদেশ। জামাতি, রাজাকারদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এক শ্রেণীর কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের প্রচার অনুযায়ী জনবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বাংলাভাষীরা নাকি পেয়েছে তাদের নিজস্ব একটি দেশ। মোল্লাবাদী সন্ত্রাস ও হিংসায় জারিত হয়ে একদিন সেই দেশটি যে একটি পুরোদস্তুর পাকিস্তানে পরিণত হবে, তা এই দূরদর্শিতাহীন, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ছিল ধারণার অতীত। বর্তমানে একটি ভয়ংকর ইসলামিক স্টেটে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ, যে দেশটি ভয়ানক ভারত বিদ্বেষী। রাজাকাররা সেই দেশে হিন্দুদের টিকতে দেবে না, হিন্দুদের আওয়ামি লিগ বলে দাগিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে ধরে এনে হত্যা করবে এবং তাদের করালগ্রাস থেকে বাদ যাবে না ‘ছায়ানট’।

বঙ্গ সংস্কৃতির পীঠস্থান হলো ছায়ানট। বাঙ্গালির জাত্যভিমান ছায়ানট। গত ১২ ডিসেম্বর ইনকিলাব মঞ্চের নেতা, তথা ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে জেহাদি অভ্যুত্থানের নেতা ওসমান হাদিকে হত্যা করে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারী। তার প্রতিশোধে গত ১৯ ডিসেম্বর ‘ছায়ানট’ ভবনে রাতভর চলে ভাঙচুর। ২০২৪ থেকেই বাংলাদেশ জুড়ে চলছে ভয়ংকর রাজনৈতিক অস্থিরতা। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত আওয়ামি লিগ সরকারকে উৎখাত করে জেহাদিরা। সম্প্রতি শেখ হাসিনাকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে তাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশের একটি আদালত। কিন্তু ছায়ানট? এই সংস্কৃতি কেন্দ্রটিও পড়বে জেহাদিদের প্রতিশোধের কবলে? সেইদিন ছায়ানট ভবন আক্রমণ করে তবলা, হারমোনিয়াম, ফকির লালনের ছবি, পুঁথি, সংগীত গবেষণা গ্রন্থ সবেতেই আগুন ধরায় উন্মত্ত জেহাদির দল। ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ফলে দাউদাউ করে জ্বলে সবকিছু ছাই হয়। আসলে ছাই হয় বাঙ্গালিয়ানা। ছাই হয় বাঙ্গালির রুচি, ভাষা, শিক্ষা, মানবতাবোধ। যা কিছু গঠনমূলক, চিন্তামূলক, বোধমূলক— ঢাকার ধানমণ্ডিতে তা সবকিছুই যেন সেদিন ধ্বংস হয়। গত ১৯ ডিসেম্বর ঢাকায় সেগুনবাগিচা-স্থিত ‘উদীচী’ কার্যালয়েও অগ্নিসংযোগ করে জেহাদিরা। গত কয়েকমাস ধরেই বাংলাদেশ জুড়ে তুঙ্গে উঠেছে বাঙ্গালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ। গত বছর সাতক্ষীরা বইমেলায় উদীচীর স্টলে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, ঢাকায় ‘সব্যসাচী’র স্টলে আক্রমণ এবং টাঙ্গাইলে লালন স্মরণ উৎসবে বাধা দানে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতি জগৎ।

কাদের দখলে আজ বাংলাদেশ? ২০২৪-এর অনেক আগে থেকেই অনুভূত হচ্ছিল যে, আবার পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হওয়ার পথে হাঁটছে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ। তখন পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও সেকুলার বোদ্ধাদের কাছে তা ঠিক গ্রহণযোগ্য মনে হতো না। অনেক সময়ই তারা উলটো অভিযোগ করত যে, এসব ন্যারেটিভ হলো— ‘ইসলামোফোবিয়া’। বাস্তব হলো, যুক্তিবোধসম্পন্ন ভারতীয়দের মধ্যে কোনো ইসলামোফোবিয়া নেই। জেহাদ ও জেহাদিদের স্বরূপ সম্পর্কে পরিচিত ভারতীয়দের মধ্যে হয়তো রয়েছে মোল্লাবাদফোবিয়া। বাংলাদেশ জুড়ে অনেক দিন ধরেই স্লোগান উঠছে, ‘আমরা সবাই হবো তালিবান, বাংলা হবে আফগানিস্তান!’ সেই স্লোগান তোলা জেহাদিরা আজ বাংলাদেশকে সত্যিই মিনি আফগানিস্তানে পরিণত করেছে। ঘোষিত তালিবানি শাসন হয়তো সেদেশে নেই, কিন্তু জেহাদি চিন্তাধারার আগ্রাসনে তালিবানি শাসনের চেয়ে কোন অংশে তারা কম? কতটা ঘৃণা ও নৃশংসতা পুঞ্জীভূত হলে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় ‘ছায়ানট’? কাকতালীয়ভাবে ২০২৫-এর সেপ্টেম্বরেই শতবর্ষে পদার্পণ করেছিল বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাব্যগ্রন্থ ‘ছায়ানট’। সেই শতবর্ষেই গ্লানিতে ন্যুব্জ ছায়ানট। তবে কি বিদ্রোহী কবিও জামাতিদের কাছে আজ অসহনীয় হয়ে উঠছেন? দুটো বিষয় এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। শিল্পকলা সৃষ্টির কেন্দ্র ছায়ানট ভবন অগ্নিদগ্ধ হলো। বোধহয় আক্রমণ সংঘটিত হলো শতাব্দীপ্রাচীন কাব্যগ্রন্থের ওপরেই। আজ যখন মহাসমারোহে ‘ছায়ানট’-এর শতবর্ষ উদ্‌যাপন হওয়ার কথা, তখন ছায়ানট-নামাঙ্কিত সাংস্কৃতিক পীঠস্থানটিই জ্বলল। যা কিছু মননশীল ও



সৃষ্টিশীল, যা কিছু সমাজ গঠনের সদর্থক উপাদান, তাকে ধ্বংস করাই হলো মোল্লাবাদের আসল চরিত্র। ছায়ানট ভবন এবং সেই ভবনে সংরক্ষিত শিল্পকর্ম ধ্বংসে বাঙ্গালির ললাটে অঙ্কিত হলো কলঙ্কচিহ্ন। পূর্ববঙ্গের মাটিতে মোল্লাবাদের এই বাড়বাড়ন্ত হলো মানবতার ওপর আঘাত।

মোল্লাবাদীদের কাছে কবি নজরুল কিন্তু খুব একটা আদরের বা শ্রদ্ধার নাম নন। সেই কবিই রচনা করেছিলেন, 'গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।/ নাহি দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ অভেদ ধর্ম জাতি/ সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।' তখন থেকেই তিনি মোল্লাবাদের পথের কাঁটা। বার বার তিনি বৈষম্যের বিরোধিতা করেছেন। কবি নজরুলের জনপ্রিয়তার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে মোল্লাবাদীদের কাছে জোঁকের মুখে নুন পরার মতো ঠেকে। কবি, সাহিত্যিকদের আক্রমণ করে মোল্লাবাদীরা একসময় ঘোষণা করে, 'হিন্দুসমাজের বাহবার লোভেই কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, জসিমউদ্দিন, বন্দে আলি মিয়া, হুমায়ুন কবির প্রমুখ সাহিত্যিক বিশেষ নীতিতে সাহিত্যচর্চা করে থাকেন।' (তথ্যসূত্র : দৈনিক তকবিরে উল্লেখিত সূত্র; নেপাল মজুমদার রচিত 'যুক্তবঙ্গে মাতৃভাষা ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজ')

মোল্লাবাদীদের আক্রমণ কবি নজরুলের ওপর এতটাই প্রকট হয় যে, তাঁকে কাফের কবি পর্যন্ত বলা হয়। 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় নজরুল জেহাদিদের মুখের ওপর বলতে পেরেছেন, 'বর্তমানে কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবি/ কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুজে তাই সই সবি।' অতএব ইউনুসের শাসনাধীন মোল্লাবাদী বাংলাদেশে সেই 'কাফের কবি' কি আর রেহাই পাবেন? ২০২৪-এর শেষে মহম্মদ ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদিও কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি'র স্বীকৃতি দেয়। বরং এই কুনাট্যে শামিল না হলেই হয়তো ভালো ছিল। অন্তত ইতিহাসে এটা লেখা থাকত না, যাঁকে ১৯৭২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সরকারিভাবে 'জাতীয় কবি'র স্বীকৃতিদান করেনি বাংলাদেশ, তাঁকে যে সরকার সেই স্বীকৃতি দেয়, সেই সরকারের আমলে এবং শতাব্দীতম বর্ষেই ভস্মীভূত হয় 'ছায়ানট'। প্রকৃতপক্ষে, দু'টি ছায়ানটই যেন আক্রান্ত হলো। সাংস্কৃতিক পীঠস্থান ছায়ানট ভবন-সহ কবি নজরুল রচিত কাব্যগ্রন্থ—দু'টিই পুড়ল জেহাদি আগ্রাসনের আগুনে। দেশ বিভাজনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ পৃথক দেশ হিসেবে গঠিত হলেও 'ছায়ানট'-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবন পদ্ধতি হলো ভারতীয়। হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, মহিলাদের সম্মান, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সুরক্ষা, স্বাধীন বাঙ্গালিয়ানা— সবকিছুই যখন জামাতিদের অধীনে, জেহাদিদের হুকুমে বিপদগ্রস্ত ও সংকটাপন্ন হয়, তখন তা ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের সমতুল্য ঠেকে। সাহিত্য, বিশেষত সংগীত, সুর-তাল-ছন্দ যে শাসনে সংকটের শিকার হয়, বুঝতে হবে তা 'অন্ধকারময় যুগ'। বাংলাদেশে এই অন্ধকার থেকে উত্তরণের পথ ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষ্য থেকেছে, ঔরঙ্গজেবের পরই কিন্তু মুঘল শাসনের পতনের সূত্রপাত হয়।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ক্যাথরিন ব্রাউনের গবেষণা দলিল 'হিন্দুস্তানী মিউজিক ইন দ্য টাইম অফ ঔরঙ্গজেব'-এ মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবের দ্বারা ভারতীয় সংগীতের শ্বাসরোধের ঘটনাকেই মুঘল শাসনের পতনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে মুঘল শাসনের অবসান হলেও সেই অন্ধকার সময়ের রেশ থেকে যায়। জেহাদি চিন্তাধারা যখনই মাথাচাড়া দিয়েছে, তখনই সামনে এসেছে তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। সংগীত ও সাহিত্য পরস্পর পরিপূরক এবং একে অপরের সঙ্গে আবিষ্ট। তাই যখন ছায়ানটে তানপুরা দাউ দাউ করে জ্বলে, তখন কিন্তু জ্বলতে থাকে প্রতিটি নজরুলগীতি। বাঙ্গালিয়ানা বিপন্ন হয় বাংলাদেশে। এপার বঙ্গের বাঙ্গালিরা ওপারে সংঘটিত ভয়াবহ ঘটনাগুলি সম্পর্কে যেটুকু সংবাদ পাচ্ছেন, সেটাই রীতিমতো হৃদয়বিদারক। হারমোনিয়াম, তবলা-সহ যাবতীয় শিল্পকর্ম ধ্বংসের থেকে ওদেশটাকে

হিন্দুশূন্য করার অপপ্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো দূরত্ব বা পার্থক্য নেই। এ যেন একই মুদ্রার দু'টি পিঠ। একই সঙ্গে সংঘটিত হয় বাঙ্গালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত এবং হিন্দু নিধন যজ্ঞ। বাংলাদেশে জেহাদি বর্বরতা এবং কবি নজরুল রচিত সাহিত্যের অসাম্প্রদায়িক বার্তা— সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলা দু'টি বিষয়। তাই বাংলাদেশে কবি নজরুল সরকারি স্বীকৃতি পেলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি লাভ থেকে তিনি বহু মাইল দূরে। প্রবাসী সাহিত্যিক গোলাম মুর্শিদ, যিনি সর্বসমক্ষে বারবার কবি নজরুলের অসাম্প্রদায়িক রূপ ও চরিত্রটি তুলে ধরতে চাইতেন, তিনিও আজ মোল্লাবাদের কাছে পরাজিত।

হাজার বছরের বাঙ্গালি সংস্কৃতির অসংখ্য থিম কিন্তু জীবন্ত ছিল বাংলাদেশে। জেহাদি অন্ধকার নেমেছে আগেই, তথাপি ভাষা ও সংস্কৃতির অনুশীলন ছিল; সমাজের সর্বস্তরে আরব সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ থাকলেও বাঙ্গালিয়ানার চর্চাটাও পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। ২০২৪-এর আগস্টের পর বাঙ্গালির সব পরিচয় স্তব্ধ হলো পূর্ববঙ্গে। ১৯৭১ সালে পাক সেনাবাহিনী এবং রাজাকার সন্ত্রাসীদের দ্বারা যে বীভৎস গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, তার লক্ষ্যটাই ছিল বাঙ্গালি জাতির ধ্বংস, হিন্দু খেদাও। 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ জেনোসাইড স্কলার্স'-এর প্রেসিডেন্ট ড. ড্যানিয়েল ফিয়েরস্টাইন বলেছেন যে, ওই গণহত্যা বাঙ্গালিকে ধ্বংস করতে পারল না ঠিকই, কিন্তু পাকিস্তানি হানাদাররা বাঙ্গালি মননে এক অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার করতে পেরেছিল।

তখন থেকেই মোল্লাবাদের লক্ষ্য হলো মানুষকে নিষ্পেষণ করো। বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করো। লক্ষণীয় যে ১৯৭১-এর আগে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখনই সেই দেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) ক্রিটিকাল থিংকিং বন্ধ হলো। নিষিদ্ধ হলো রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র সংগীত। ১৯৬৭-র ২২শে শ্রাবণের আগে পূর্ব পাকিস্তানে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়— 'রবীন্দ্র সংগীতের ভাব, ভাষা ও সুরের কোনোটার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের তৌহিদবাদী জনসাধারণের তিলমাত্র যোগ নেই। রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্য ও কৃষ্টি পূর্ব পাকিস্তানি তমদ্দুনের সম্পূর্ণ বিপরীত।' সেই সময়ও 'ছায়ানট', 'বুলবুল ললিত কলা অ্যাকাডেমি', 'ঐকতান'— সব প্রতিষ্ঠানের ওপর জারি হয় নিষেধাজ্ঞা। সেই সংকটের সময়েও ছায়ানট সেদিন গ্রহণ করে সাহসী পদক্ষেপ। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তার বঙ্গ সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখে। অব্যাহত থাকে রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতির চর্চা। ছায়ানটের সংকল্পের গভীরতা মেপে বদরুদ্দিন উমর প্রকাশ করলেন 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা'। '৭১-এর আগে পূর্ব পাকিস্তানে যে আয়ুব-মোনেম চক্র তৈরি হয় তার কাজ ছিল রবীন্দ্র চর্চা, মুক্তচিন্তা, বাঙ্গালির ভাষা-সংস্কৃতি নিষিদ্ধকরণ ও ধ্বংস। সেদিনের সেই পূর্ব পাকিস্তান আর আজকের ইউনুস শাসিত বাংলাদেশ যেন হুবহু কার্বন কপি। সত্যি, 'ছায়ানট' চিরকালই বড়ো সাহসী। পূর্ব পাকিস্তানে যখন বাঙ্গালির প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সব নিষিদ্ধ, তখন একটি ভাষণে মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আমরা মির্জা গালিব, সক্রেটিস, শেক্সপিয়র, অ্যারিস্টটল, দান্তে পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য, আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙ্গালি কবি এবং বাংলা কবিতা লিখিয়া যিনি বিশ্বকবি হইয়াছেন। আমরা এই ব্যবস্থা মানি না...।'

আজ ইউনুস নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ মোল্লাবাদের হাতে বন্দি। কিন্তু ইতিহাসকে হয়তো ভয় পাচ্ছে এই জেহাদি শক্তি। তারা ভাবছে যদি আবার সেদিনের মতো প্রতিবাদ-প্রতিরোধের তীর্থ হয়ে ওঠে ছায়ানট! তবে তো মহাবিপদ। দাও পুড়িয়ে। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের বছরে, ১৯৭১ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র লিগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মুজিবুর রহমান উল্লেখ করেছিলেন যে, গানের ভাষা, শব্দ কেড়ে বদলে গাওয়ার চেষ্টা মুসলমানরা করেছে; এবং আরবি হরফে বাংলা লেখার অপকৌশল যে নেওয়া হয়েছিল, বিভিন্ন ঘটনায় তাও স্পষ্ট হয়েছে। মোল্লাবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান পরিণত হয় বাংলাদেশে, কারণ সেদিন বাঙ্গালিয়ানার হাত ধরেছিল ভারত। বাঙ্গালি জাতিসত্তার লড়াইয়ে পূর্ণ সমর্থন, সাহায্য, রসদ সব দিয়েছিল ভারত। আজ আবার মোল্লাবাদের হাতে পরাধীন বাংলাদেশ, কারণ মহম্মদ ইউনুসের সরকার পুরোপুরি ভারত-বিরোধী। তারা প্রত্যক্ষভাবে জামাত তোষণকারী এবং রাজাকার বাহিনীর সমর্থক। বাস্তবিক অর্থে সহজ-সরল বাঙ্গালি আজ ওই দেশে শেষ হওয়ার পথে। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালির আর্তনাদ কিন্তু বিশ্বের সব বাঙ্গালির কান্না; জেহাদি শোষণের মুখে পড়ে এক বা দুই প্রজন্মে ধর্মান্তরিত মুসলমান পরিবারগুলির একটি অংশ যারা এখনও মনে মনে নিজেদের খাঁটি বাঙ্গালি মনে করে তাদের সবার কান্না; বাংলাদেশের সব হিন্দুদের কান্না তো বটেই। সংস্কৃতি চর্চা, কর্মশক্তি, সাধনশক্তির বোধ বিলুপ্ত হতে চলেছে একটা জাতির; তাদের সব শক্তি হরণ করেছে বিষাক্ত মোল্লাবাদ, পরাস্ত করেছে পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালিদের বুদ্ধিমত্তার ধার, যুক্তিবোধ এবং প্রশ্ন করার তীক্ষ্ণতাকে। যে জাতির ললাটে আজ এত অন্ধকারের ছায়া, তারা যেন কোনো প্রতিক্রিয়ায় ফেটে পড়তে না পারে, তাই জেহাদিরা আগুন ধরিয়ে দেয় ছায়ানটে। কারণ এই 'ছায়ানট' আগামীকাল কলম ধরে প্রতিবাদমুখর হতে পারে, প্রতিবাদী সুর বাঁধতে পারে। তাই এই প্রতিবাদী কণ্ঠকে অবরুদ্ধ করো। তাদের শব্দ প্রয়োগ, ভাষা চর্চায় পাঁচিল তোলো। কারারুদ্ধ করো যুক্তিকে। যারা বন্ধন মোচন করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করেছিল, তাদের একাংশের ভিতরেও গত ৩০-৪০ বছর ধরে বইল মোল্লাবাদের ফল্গুধারা। আগামীদিনে ওরা কি টের পাবে আনন্দহীন জীবন-মৃত্যুর সর্বব্যাপী অবসাদ? পূর্ববঙ্গের ওপর থেকে ক্রমশ সরছে বঙ্গ সংস্কৃতির ছায়া। কবি নজরুলের ছায়ানট কাব্যগ্রন্থের একটি জনপ্রিয় কবিতা হলো 'বিজয়িনী', যেখানে অসাধারণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কবির একান্ত কিছু অনুভূতি— 'হে মোর রানি! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে,/ আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণতলে এসে।...' ইউনুসের নেতৃত্বাধীন মোল্লাবাদী বাংলাদেশ আজ ছায়ানট কাব্যগ্রন্থের শতবর্ষে কবি নজরুল রচিত এই কবিতাটির ভাবের বিপ্রতীপে এই ভয়াবহ চক্রান্ত করল। সম্মান পেল না ছায়ানট কাব্যগ্রন্থ।

আগুনে ছাই হলো ছায়ানট সাংস্কৃতিক তীর্থ। ওদেশে বাঙ্গালির ছায়া আগামীদিনে আর কি থাকবে? ■



কর্ণাবতীতে ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় অধিবেশন

গত ২৬, ২৭, ২৮ ডিসেম্বর গুজরাটের কর্ণাবতীর কচ্ছিধাম প্রেরণা পীঠে ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় অধিবেশন সম্পন্ন হলো। অধিবেশনে সারা দেশের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার ৬০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় অধ্যক্ষ গোপাল সৈনী, অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী রাজ চৌধরী, সহ সংগঠন মন্ত্রী মধুময় নাথ, চেতন কাশ্যপ, প্রসাদভাই প্রমুখ। উদ্বোধনী সত্রে উপস্থিত চিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেন্দ্র প্যাটেল। ভারত সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখভাই মণ্ডাভিয়া উপস্থিত থেকে সমস্ত রকমের ভারতীয় খেলার বিস্তার এবং খেলোয়াড় নির্মাণে ক্রীড়া ভারতীকে সর্বতোভাবে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। অধিবেশনে ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ সংগঠন মন্ত্রী মধুময় নাথ-সহ দক্ষিণবঙ্গের ২৬ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন।



কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর লোককলা বিষয়ক কর্মশালা

গত ২৭ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর লোককলা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো কোচবিহার শহরের বিবেক তীর্থের সভাগৃহে। কর্মশালায় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর জেলা এবং শিলিগুড়ি মহানগর থেকে ৪২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষকরূপে ছিলেন সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় লোককলা বিভাগের সংযোজক নিরঞ্জন পণ্ডা। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রপ্রমুখ অধীর নীলকণ্ঠ রায় এবং উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক উদয় কুমার দাস। উপস্থিত প্রতিনিধি কলাকুশলীরা ভাওয়াইয়া গান, কুশান গান ও মনসা গান পরিবেশন করেন। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন প্রান্ত মঞ্চীয়কলা বিভাগ সংযোজক রামনারায়ণ সূত্রধর। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রান্ত লোককলা বিভাগ সংযোজিকা শ্রীমতী অপর্ণা বর্মা।



ফ ঃ ৪



হুগলীর কাপাসডাঙ্গা শাখার উদ্যোগে সহস্র পূর্ণচন্দ্রদর্শন অনুষ্ঠান

গত ২৬ ডিসেম্বর হুগলী জেলার সঙ্ঘের কাপাসডাঙ্গা শাখার উদ্যোগে পূর্বতন জেলা সঙ্ঘচালক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বতন প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য মহাশয়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর খন্যানস্থিত বাসগৃহে সহস্র চন্দ্রদর্শন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হুগলী জেলার সহ জেলা সঙ্ঘচালক আনন্দ মোহন দাস এবং বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা। অনুষ্ঠানে শ্রীভট্টাচার্য ও তাঁর সহধর্মিণীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ কার্যকারিণীর সদস্য বীরেন পাল মহাশয়।
অনুষ্ঠানে সুনীলেন্দুবাবু তাঁর সঙ্ঘজীবনের ইতিহাস এবং সঙ্ঘকাজের প্রেরণাদায়ী অভিজ্ঞতা সকলের সামনে তুলে ধরেন।

বনগাঁর খয়েরমারীতে গোপাল মেলা ও গোপাল বনভোজন উৎসব

বনগাঁ মহকুমার খয়েরমারীতে বনগাঁ হরিভক্তি প্রণয়নী সভার উদ্যোগে গত ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহ্যবাহী গোপাল মেলা ও গোপাল বনভোজন মহোৎসব। মেলা উপলক্ষ্যে বনগাঁ মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু ভক্ত তাঁদের গোপালকে নিয়ে আসেন এবং মন্দির প্রাঙ্গণে স্থাপন করেন। সনাতনী রীতি মেনে সমস্ত গোপালকে বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হয় এবং সেই ভোগ উপস্থিত ভক্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।





উত্তর ও মধ্যবঙ্গে তুলসীপূজন দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পরিচালিত 'সামাজিক সমরসতা অভিযান'-এর পক্ষ থেকে গত ৭ বছর ধরে ২৫ ডিসেম্বর দিনটি 'তুলসীপূজন দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। হিন্দুসমাজ যাতে এই দিনটিতে তুলসী পূজনে উৎসাহিত হয়, সেই লক্ষ্যে প্রচার-প্রসারে ব্রতী হয়েছে পরিষদ। 'সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ প্রজ্বলন'-এর ভাবনাকে সামনে রেখে পরিষদের উদ্যোগে সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত হয়। বিগত কয়েক বছর ধরে এই কার্যক্রম সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সার্বজনিক রূপ নিতে শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গের ঈশ্বরপুর, মালদহ, আলিপুরদুয়ার চা-বাগান, মধ্যবঙ্গের ফরাক্কা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, ধুবুলিয়া, খামারডাঙ্গা-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গে হয় গীতাপাঠ, হোমযজ্ঞ ও সহভোজ। অনুষ্ঠানে আগতদের মধ্যে তুলসীচারা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তুলসীর ঔষধি গুণাবলীর বর্ণনা-সহ সামাজিক সমরসতার বার্তা দেওয়া প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। 'বড় দিন' উপলক্ষ্যে সফট্ কনভারশনের অপকৌশল বুঝতে পেরে হিন্দুসমাজ এই পবিত্র তুলসী পূজনে অংশগ্রহণ করে। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক তুলসী পূজনকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে পরিষদের পক্ষ থেকে সমাজের সকলকে আরও উদ্যোগী হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তুলসীপূজনের প্রচার-প্রসারের ফলে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও সুপ্রভাব পড়বে বলে তারা জানান।

রিষড়া প্রেমমন্দিরে মাতৃভক্ত তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ৩১ ডিসেম্বর রিষড়া প্রেমমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রেমমন্দির পরিসরে তিনদিন ব্যাপী ধর্মসভা-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সূচনা হলো। এই উপলক্ষ্যে আশ্রমে বহু সন্ত মহাত্মার আগমন হয়। অনুষ্ঠানের প্রথমদিনে ছাত্র-ছাত্রীদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বহু প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। অপরাহ্নে ধর্মসভায় প্রেমমন্দিরের সন্ন্যাসী স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ সাধুসন্তদের উত্তরীয় প্রদান করে সম্মানিত করেন এবং বসে আঁকো প্রতিযেগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার বিতরণ করেন।

উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত।

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475



নেতাজীর ‘মৃত্যুদিন ১৮ আগস্ট’ সরকারি ভাবে বাতিলের দাবি আজাদ হিন্দ পিপলস্ মিশনের

১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অখণ্ড ভারতবর্ষের আজাদ হিন্দ সরকারের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দু'টির নামকরণ তিনি করেন শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ। এই দিনটিকে স্মরণ করতে গত ৩০ ডিসেম্বর ‘আজাদ হিন্দ পিপলস্ মিশন’ সংগঠনের পক্ষ থেকে কলকাতার রেড রোড-স্থিত আজাদ হিন্দ স্মৃতিসৌধে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। সংগঠনটির উদ্যোগে এদিনের অনুষ্ঠানে আজাদ হিন্দ সরকারের পতাকা উত্তোলন করা হয়। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং দেশের মুক্তিসাধক বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়।

এছাড়া, সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন সংগঠনের সভাপতি, নেতাজী গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী। বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ দিয়ে তিনি বলেন যে, ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্ট তাইহোকুতে আদৌ কোনো বিমান ভেঙে পড়েনি। সম্প্রতি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণান ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত জানিয়েছিলেন যে, ১৯৪৫ সালে ঘটে নেতাজীর অন্তর্ধান। উল্লেখ্য, জাপানের রেনকোজি বৌদ্ধমন্দিরটিও ১৯৮৯ সালে আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায় যে, পরবর্তীকালে কেউ বা কারা কাঠের বাক্সে কিছু আধপোড়া হাড়গোড় রেখে আসে এবং বর্তমানে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষ থেকে তার ডিএনএ টেস্টের দাবি তোলা হচ্ছে।

এই প্রেক্ষিতে ড. চৌধুরী দাবি তোলেন কে বা কারা ছাই রেখে এসেছে, তাই নিয়ে সিট গঠন করা উচিত। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে দশটি দাবি জানানো হয়েছে বলে জানান সংগঠনের সেক্রেটারি এসপি তেওয়ারী। তার মধ্যে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে বিচারপতি মনোজ কুমার মুখোপাধ্যায় কমিশনের রিপোর্ট পুনর্বিবেচনা এবং সংসদে পুনরায় রিপোর্টটি পেশ করার দাবি জানানোর পাশাপাশি অন্যান্য দাবি জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান। দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হলো— নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে অখণ্ড ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং আজাদ হিন্দ সরকারকে অখণ্ড ভারতের প্রথম সরকার হিসেবে আইনগত স্বীকৃতিদান, ‘জয় হিন্দ’কে ভারতের সরকারি স্লোগান ঘোষণা, ২৩ জানুয়ারি নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে দিনটিকে ভারতের জাতীয় ছুটি ও জাতীয় উৎসব হিসেবে ঘোষণা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর বিক্রমের ইতিহাস স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা এবং বাকি যাবতীয় গোপনীয় নেতাজীর ফাইল প্রকাশ। ড. গৌতম পাণ্ডে, তপতী চক্রবর্তী, তেজেন্দ্র দাস-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, রেড রোডের প্রান্তে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির নীচে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ বিবেকানন্দ সেন্টার ফর সোশাল সার্ভিসের উদ্যোগে ‘৩০ ডিসেম্বর’ দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। উপস্থিত ছিলেন শুভাশিস চৌধুরী, জয়দীপ ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। ■

হারানো পত্রিকা—চার

এক নতুনের দিশারি
প্রবাসী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর মাসিক ‘প্রবাসী’। সম্পাদক আর পত্রিকা। দু’টি নাম মিলে মিশে একাকার। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এ এক অনন্য ঘটনা।

‘প্রবাসী’ প্রকাশিত হয়েছিল এলাহাবাদ থেকে ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে (১০০১ খ্রি:)। প্রথম সংখ্যাতেই ছিল রবীন্দ্রনাথের ‘প্রবাসী’ কবিতাটি— ‘‘সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া/...প্রবাস কোথাও নাহি-রে নাহি-রে জনমে জনমে মরণে।’ পত্রিকার ‘সূচনা’-য় রামানন্দ লেখেন, ‘‘সর্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা ‘প্রবাসী’ প্রকাশিত করিতেছি। বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিক পত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম। বঙ্গদেশ হইতে দূরে থাকায় কী লেখা, কী ছবি, কী ছাপা, সকল বিষয়েই আমাদিগকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় যদি লেখক ও পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই তাহা হইলে নিশ্চয় আমাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে। প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্যের বিচার হওয়া ভালো। এই জন্য আমরা আপাতত আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।’’ এরপরই ছিল কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রায় চার পৃষ্ঠা জোড়া কবিতা ‘আবাহন’।

বঙ্গদেশ থেকে দূরে প্রবাসে পত্রিকার জন্ম। তাই পত্রিকার নাম ‘প্রবাসী’। প্রাথমিক অর্থ বা বক্তব্য ছিল এটাই। কিন্তু এ নামের অর্থব্যাপ্তি ঘটতে লাগল না বড়ো বেশি সময়। ‘আমরা যে স্বাধীনতা হারিয়ে নিজের ঘরে পরাশ্রিতের মতো বাস করে প্রবাসী হয়ে আছি— এই অর্থটাই প্রধান হলো। প্রবাসীর শিরোভূষণ হলো এই বাণী ‘নিজবাসভূমে পরবাসী হলে’...’

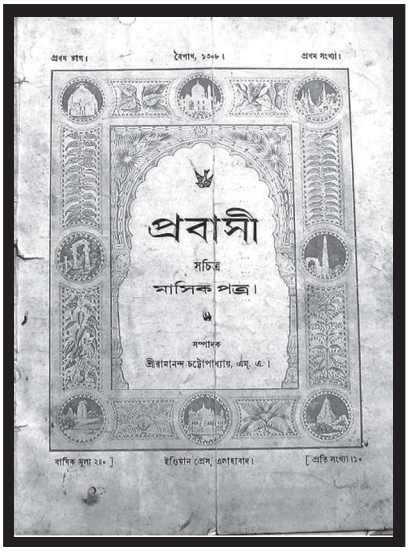

(সোমেন্দ্রনাথ বসু— সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

‘প্রবাসী’-র প্রথম সংখ্যাটি ছিল ৪০ পৃষ্ঠার। পত্রিকার আয়তন ছিল ১৬.৫ সেমি × ২২.৫ সেমি। প্রতি পৃষ্ঠায় থাকত ৭ সেমি মাপের দুটি করে স্তম্ভ বা কলম। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘প্রবাসী’র শেষ সংখ্যা ১৩৫০ সালের পৌষ সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৯৬। মাসিক মূল্য ছিল ছ’আনা এবং বার্ষিক মূল্য আড়াই টাকা। ১৩৫০-এ ওই মূল্য দাঁড়ায় বার্ষিক সাড়ে ছ’টাকা। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর প্রথমে তাঁর বড়ো ছেলে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কেদারনাথের মৃত্যুর পর তাঁর ছোটোভাই অশোক চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। শেষ দিকে পত্রিকাটির প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। এইভাবে মোট সাতাত্তর বছর চলার পর ‘প্রবাসী’-র যাত্রা শেষ হয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ বা প্রয়াগ থেকে প্রকাশিত মাসিক ‘প্রবাসী’ আবির্ভাব লগ্নেই এমন সাড়া জাগায় যে ওই সংখ্যাটি আবার ছাপতে হয়েছিল।

‘প্রবাসী’-র প্রথম সংখ্যায় সূচনা-সহ প্রকাশিত মোট রচনার সংখ্যা ছিল দশ। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতা ছাড়া ছিল সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা তিনটি— ‘সূচনা’, ‘অজন্টা গুহা চিত্রাবলী (সচিত্র)’ এবং নিয়মিত বিভাগ ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’। ছিল বিজ্ঞান-সহ বিভিন্ন বিষয়ে লেখা পাঁচটি প্রবন্ধ। লেখক ছিলেন যোগেশ চন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীকমলাকান্ত শর্মা।

‘প্রবাসী’ প্রথম সংখ্যা পড়ে রীতিমতো মুগ্ধ হন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তাঁর মন্তব্য, ‘‘...একালের অতি উচ্চ দরের মাসিক পত্রও বারো আনা পড়িয়া উঠিতে পারি না, ‘প্রবাসী’-র ষোলো আনাই পড়িয়াছি ও পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। সর্বাপেক্ষা ভালো লাগিল ‘অজন্টা গুহা চিত্রাবলী’। ...সংগ্রহ প্রণালীতে বাহাদুরি আছে। এরূপ প্রবন্ধ আর কোথাও দেখিয়াছি মনে হয় না। এরূপ প্রবন্ধ পড়িলে স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাতব্য কত আছে তাহা বোঝা যায়। দুঃখের বিষয় এই জাতীয় প্রবন্ধ অধিক লিখিত হয় না, অথবা লিখিত হইলেও ভাষা ও রচনা ভঙ্গীতে সুখপাঠ্য হয় না।...’’ (রামানন্দ, পৃ. ৮৬)।

প্রসঙ্গত, ‘প্রবাসী’-র প্রথম সংখ্যায় কোনো গল্প বা উপন্যাস ছিল না। তাই-বা কেন দ্বিতীয় সংখ্যায় একটি গল্প থাকলেও প্রথম বছরের ‘প্রবাসী’ ছিল কেবলই প্রবন্ধময়। প্রায় প্রথম থেকে ‘প্রবাসী’-তে রসরচনার অবস্থান থাকলেও এ পত্রিকায় প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৩১৪-র ভাদ্র সংখ্যায়। অর্থাৎ পত্রিকাটি সাত বছরে পা দেওয়ার পর সেখানে স্থান পেল

উপন্যাস। সেটি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'। ধারাবাহিকভাবে ওই সুবিশাল উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'-তে।

এই উপন্যাসের নেপথ্যে রয়েছে অন্য এক কাহিনি। 'প্রবাসী'-র ১৩১৪-র আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প 'মাস্টারমশাই'। এরপরই রামানন্দ তিনশো টাকা আগাম দেন রবীন্দ্রনাথকে 'প্রবাসী'-র জন্য একটি উপন্যাস লেখার জন্য। রবীন্দ্রনাথের কথায়, ''...এরই কিছুকাল পরে একদিন রামানন্দবাবু আমাকে কোনো অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্যস্বরূপ পাঠালেন তিনশো টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, নাও যদি পারেন আমি কোনো দাবি করব না। এতবড়ো প্রস্তাব নিষ্ক্রিয়ভাবে হজম করা চলে না। লিখতে বসলুম 'গোরা', আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোনো কারণে একবারও ফাঁকি দিইনি। যেমন লিখতুম তেমনি পাঠাতুম।" (রামানন্দ, পৃ. ১২৭-১২৮)।

গল্প, উপন্যাস 'প্রবাসী'-র আকর্ষণকে বাড়িয়ে দিল শতগুণে। প্রবাসে 'প্রবাসী'র আবির্ভাব লগ্নে প্রাথমিকভাবে তাতে স্থান পায় কবিতা, নানা বিষয়ের প্রবন্ধমালা, রসরচনা এবং সেই সঙ্গে প্রবাসী বাঙ্গালিদের নানা সমস্যা ও বঙ্গভাষার নানা সংকটের কথা। সেই সময় বিষয়বৈচিত্র্যে, মুদ্রণ পরিপাট্যে, নানা বর্ণের চিত্রের প্রকাশে, শিল্পকলা সম্পর্কে ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ও তথ্য সরবরাহে এবং বিজ্ঞানের নানা শাখার বিষয়বস্তুকেও সাধারণের বোধ্য ভাষায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে বঙ্গদেশ এবং বঙ্গের বাইরের বাঙ্গালিদের চিত্তের আনন্দ ও মননের বিকাশ ঘটাতে থাকে।

'প্রবাসী'-র আগে আর কোনো পত্রিকাকে এভাবে একটি সর্বভারতীয় রূপ নিতে দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে অবশ্যই 'প্রবাসী'- সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নীতিবোধ ও মানসিকতার ভূমিকাই ছিল প্রধান। তিনি আজীবন বিশ্বাস করতেন, 'আমরা আগে ভারতীয় পরে বাঙ্গালি' বা অন্য প্রদেশের মানুষ।' এই জাতীয়তাবোধই 'প্রবাসী'-কে দেয় একটি জাতীয়তাবাদী রূপ। সেটাই হয় তার বড়ো সম্পদ।

সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গি, সরসচিত্ত, মুক্তমন ও মানবপ্রীতিই একটি কাগজকে অনায়াসে চিত্ত জয়ে সাহায্য করে। এমনটাই মনে করেন বিশিষ্টজনরা। 'প্রবাসী'-র সাফল্যের পেছনেও কাজ করেছে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের এ জাতীয় গুণাবলীই। তাঁর ওইসব গুণের আভায় প্রদীপ্ত 'প্রবাসী' ক্রমে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে থাকে।

সমালোচকদের অভিমত প্রকাশ মাত্র 'প্রবাসী'-র জনচিত্ত জয়ের মূলে রয়েছে পত্রিকাটির সর্বভারতীয় আবেদন, প্রবাসী বাঙ্গালির কথার উপস্থাপনা এবং উচ্চমানের দেশিবিদেশি চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রতিরূপ প্রকাশনার নান্দনিক চিন্তা। আর 'এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই আমাদের জাতীয় জীবনে এরূপ কার্যকরী হইয়াছে যে, আমরা প্রবাসী পত্রিকাখানিকে 'জাতীয় পত্রিকা' বলিয়া গণ্য করিতে পারি। পত্রিকাখানির প্রচার বাংলাভাষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও ইহার আবেদন ছিল সর্বভারতীয়।' (যোগেশচন্দ্র বাগল : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পৃ. ৮৬)।

প্রথম থেকেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অবতীর্ণ হয়েছেন লোকশিক্ষকের ভূমিকায়। অধ্যাপক হিসেবে ছাত্রদের শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে অসাধারণ স্বকীয়তার পরিচয় দেন তিনি। পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি সেই ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হন।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ত্রিশ বছর বয়সে রামানন্দ এলাহাবাদে আসেন সেখানকার কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ হয়ে। নামে পাঠশালা হলেও সেটি ছিল তখনকার দিনের একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। তাঁরই চেষ্টায় কিছুদিনের মধ্যেই সেটি সেখানকার অন্য দুটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত হয়।

রামানন্দ কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, এলাহাবাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে পড়েন। সেই ঘনিষ্ঠতার কারণেই তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকাটি বের করেন। প্রবাসী বাঙ্গালি এবং বঙ্গদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং বঙ্গসাহিত্যের বিকাশ ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই প্রাণপাত করতে থাকেন তিনি। কিন্তু সেই সময় একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি এলাবাহাদের পাট চুকিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।

যে কায়স্থ পাঠশালাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করেন আপন শ্রম ও মেধায়, সেই কলেজ কর্তৃপক্ষর সঙ্গে মতবিরোধের কারণে ১৯০৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যক্ষপদ থেকে ইস্তফা দেন। সেই সঙ্গে ১৯০৭-এর জানুয়ারি মাস থেকেই 'মডার্ন রিভিয়ু' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করার উদ্যোগ নেন।

রামানন্দর 'প্রবাসী' পত্রিকাটি ছাপা হতো তখন এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে। ওই প্রেসের কর্ণধার চিন্তামণি ঘোষ তখন থেকেই ছিলেন রামানন্দর পাশে। 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকা ছাপার দায়ও তিনিই নিলেন। এলাহাবাদ থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে 'মডার্ন-রিভিয়ু'। কিন্তু আমলাদের নানা অপকীর্তির সমালোচনা করায় সরকারের বিষ দৃষ্টিতে পড়েন রামানন্দ। সৃষ্টি হয় নানা চাপ। রামানন্দ বাধ্য হন এলাহাবাদ ছাড়তে। সেটা ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের কথা।

১৯০৮-এর এপ্রিল বা ১৩১৫-এর বৈশাখ থেকে 'প্রবাসী' কলকাতা থেকেই ছাপা ও প্রকাশনা শুরু হয়। প্রথমে কুন্তলীন প্রেস পরে 'প্রবাসী'-র নিজস্ব ছাপাখানা থেকে।

১৩১১-র আশ্বিন থেকে 'প্রবাসী'-র শিরোভূষণ ছিল টেনিসনের কবিতা—

'Beauty, Good and Knowledge, are three sisters'

এবং 'to look on the noble forms

Maken noble thro' the sensuous organism

That which is higher...'.

১৩১৪ থেকে ইংরেজির বদলে শিরোভূষণ হিসেবে শোভা পেতে থাকে দুটি সংস্কৃত বাক্যবন্ধ— 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এবং 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। কলকাতায় আসার পর অর্থাৎ ১৩১৫-র বৈশাখ থেকে সংস্কৃতের পরিবর্তে ছাপা হতে থাকে কবি গোবিন্দ চন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে' কবিতার ক'টি পঙ্‌ক্তি—

নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর-দাস-খতে সমুদায় দিলে।
পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।।

'প্রবাসী'-র কলকাতা জীবন শুরুর মুহূর্ত থেকেই পত্রিকাটি রূপ পরিবর্তনের পর্ব শুরু হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' বের করার কিছুদিন আগেই তাঁর সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রিকায় 'সাময়িক সাহিত্যের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে উচ্চমানের পত্রিকাকে স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য তিনটি সূত্রের কথা বলেন। সেই সূত্র তিনটি হলো,— ১. সম্পাদক এবং পত্রিকার পরিচালক বা মালিক হলেন একই ব্যক্তি, ২. আর্থিক দিক থেকে পত্রিকাকে স্বচ্ছল হতে হবে, এবং ৩. বিভিন্ন বিষয়ে লেখার জন্য উপযুক্ত লেখকগোষ্ঠী ও তাঁদের জন্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

'প্রবাসী'-র আত্মপ্রকাশের আগে যা বলেছিলেন— পত্রিকা প্রকাশের পর সেই সূত্রগুলিই পূরণ বা অনুসরণ করেন একবারে আক্ষরিক ভাবে। 'প্রবাসী'-র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী দুই-ই ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একাই। সৌভাগ্যক্রমে প্রথম সংখ্যা থেকেই 'প্রবাসী' জনচিত্তজয়ী হয়ে ওঠে। পত্রিকার একটি স্থায়ী গ্রাহক গোষ্ঠীও গড়ে ওঠে। এটা রামানন্দকে যথেষ্ট স্বস্তি দেয়। গ্রাহকদের কাছ থেকে আগাম মূল্য আদায়ের পরিমাণ ছিল উল্লেখ করার মতো এবং গ্রাহক সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণেই 'প্রবাসী' শুরু থেকে পুরোপুরি লাভজনক না হলেও ঘাটতি হয়নি কোনো সময়ই। আর ছোটো বড়ো সব লেখককেই পারিশ্রমিক দেওয়ার রীতি চালু করে একটা নজির সৃষ্টি করে 'প্রবাসী', এবং সেইসঙ্গে গড়ে তোলে এক শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠীও।

মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী' চলেছিল সাতাত্তর বছরের মতো। তার মধ্যে শুরু থেকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত টানা ৪৩ বছর সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আর এই পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকদের মধ্যে ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, সুধীর চৌধুরী, সজনীকান্ত দাস, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, শান্তা দেবী ও সীতা দেবী।

'প্রবাসী'-র আরেক বৈশিষ্ট্য ছিল নিয়মিত প্রকাশ। প্রথম দিকে দু'এক বছর কিছু অনিয়ম হলেও রামানন্দের সম্পাদকতা কালে মাস মাস ঠিক সময়েই পেরিয়েছে 'প্রবাসী'। সেই সঙ্গে প্রতিমাসের শেষ দিকে দেওয়া হতো লেখকদের সম্মান দক্ষিণা।

বাণিজ্য সফল ও দীর্ঘজীবী 'প্রবাসী'-র বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয় বেশ কিছু বিষয়কে। ওইসব বৈশিষ্ট্য হলো— ১. প্রথম পূর্ণাঙ্গ রঙিন সচিত্র মাসিক, ২. এর সর্বভারতীয় আবেদন, ৩. প্রবাসী বাঙ্গালির কথা প্রকাশ, ৪. উচ্চমানের দেশি বিদেশি চিত্রকলা প্রকাশ, ৫. মুদ্রণ পারিপাট্য, ৬.সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব ও সুনাম, ৭. নব্য সাংবাদিকতার সূচনা। এর সঙ্গে ছিল সম্পাদকের নিরপেক্ষ ও মানবদরদি মন। বলা হয় সেটাই ছিল 'প্রবাসী'-র সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি।

'প্রবাসী'-র কৃতিত্ব, বাংলা ভাষা সাহিত্যে তার ভূমিকা এবং সম্পাদকের ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য,— ''প্রথম যখন রামানন্দ প্রদীপ এবং পরে প্রবাসী বের করলেন, তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগলো। আকারে বড়ো, ছবিতে অলংকৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামি জিনিস যে বাংলাদেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয়নি।...

প্রবাসী জাতীয় পত্রিকা দেশের একটা প্রয়োজন সিদ্ধি করেছে। জনসাধারণের চিত্তকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করা এর ব্রত।" (পত্রিকা পরিচয়, কার্তিক ১৩৩৮)।

নব্য ভারতীয় চিত্রকলার পুনর্জাগরণে অক্লান্ত সহযোগিতা 'প্রবাসী'-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসুদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'প্রবাসী'-তে ১৩০৯ থেকে 'চিত্র পরিচয়' নামে একটি বিভাগ চালু করা হয়। একইভাবে 'বিবিধ প্রসঙ্গ', বিজ্ঞান প্রসঙ্গ নিয়ে 'পঞ্চশস্য', 'দেশের কথা' তথা 'দেশবিদেশের কথা', সমকালীক পত্র-পত্রিকার রচনার সারসংক্ষেপ ও পুনর্মুদ্রণের জন্য 'কষ্টিপাথর', 'মহিলা মজলিশ', 'ছেলেদের পাততাড়ি' ইত্যাদি বিভাগগুলি ছিল 'প্রাবাসী'-র সাফল্য-মন্ত্র।

'প্রবাসী' বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্র না হলেও শরৎচন্দ্র বাদে সমকালের সমস্ত খ্যাতনামা ও নবীন লেখদের রচনায় মুগ্ধ করেছে পাঠক- পাঠিকাকে। এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'গোরা' ও 'শেষের কবিতা', নাটক 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা','রাজা', 'গৃহপ্রবেশ' এছাড়া 'রাশিয়ার চিঠি', 'জীবনস্মৃতি', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'ছোটো ও বড়ো' ইত্যাদি প্রবন্ধ এবং আরও বিভিন্ন ধরনের কিছু লেখা। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'নবীন সন্ন্যাসী', মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', 'অপরাজিত', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপন্যাসে সমৃদ্ধ ছিল 'প্রবাসী'। কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জীতেন্দ্রমোহন বাগচী, নজরুল, মোহিতলাল, সত্যেন দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ছিলেন পত্রিকার সম্পদ। একইসঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসু, যদুনাথ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, হেরম্ব মৈত্র প্রমুখের প্রবন্ধ পত্রিকাটিকে এক ভিন্ন উচ্চতায় তুলে ধরে।

সব মিলিয়ে 'প্রবাসী' ছিল বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক দিগ্‌নির্দেশক পত্রিকা। □

মকর সংক্রান্তি উৎসব পালনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা ও গৌরবময় ইতিহাসের উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত আছে এই উৎসব পালনের সার্থকতা।



মকর সংক্রান্তি উৎসব ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তা

পিন্টু সান্যাল

সূর্য ধনু থেকে মকররাশি অর্থাৎ নক্ষত্রসজ্জার দিকে যাত্রা শুরু করে অর্থাৎ সংক্রমণ ঘটে। সেই ক্ষণকে 'মকর সংক্রান্তি' বলা হয়। ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা যা উৎসবের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। এরকম আরও কিছু সভ্যতা যেমন মায়া, ইনকা, মিশরীয় সভ্যতার অস্তিত্ব আজ আর নেই। আমরা সনাতন এই সভ্যতার অংশ হিসেবে গর্বিত।

হরিয়ানা, পঞ্জাবে মাঘি বা লোহরি; গুজরাটে উত্তরায়ণ, তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল, অসমে বিহু, কেরালায় মাকারাভিলাক্কু, উত্তরপ্রদেশে খিচড়ি, কাশ্মীরে সাইনক্রাত, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে মকর সংক্রান্তি, পশ্চিমবঙ্গে পৌষ সংক্রান্তি বা পৌষ পার্বণ— ভারতবর্ষব্যাপী একই উৎসব বিভিন্ন নামে উদ্‌যাপিত হয়। কোথাও পিঠেপুলির উৎসব, কোথাও গঙ্গায় পুণ্যস্নান, কোথাও প্রথম ফসল অগ্নিদেবতাকে আহুতি, কোথাও খিচুড়ি সহভোজ, কোথাও আবার ঘুড়ি ওড়ানো। একই উৎসব, আয়োজন বিভিন্ন।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হলো এই উৎসবগুলোর মাধ্যমে এক হয়েই আমরা একটা জাতি যা ইউরোপিয়ানদের উপলব্ধিতে আসে না। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন পরিধানে সজ্জিত হয়েও আমরা অখণ্ড ভারতবর্ষের অংশ— একেই বিদ্বজ্জনেরা সাংস্কৃতিক জাতীয়তা বলেছেন।

দেশ গঠনের শর্ত, একসঙ্গে বসবাস করার জন্য কী ঐক্যসূত্রের প্রয়োজন তা ইউরোপীয় দার্শনিকদের থেকে শেখার চাইতে ভারতবর্ষকে অধ্যয়ন করলে বেশি ভালো বোঝা যায়। ইউরোপ বুঝেছে ভাষা এক হওয়া প্রয়োজন, কখনো বলেছে বেশভূষা এক হতে হবে, কখনো এক উপাস্যের প্রতি আনুগত্যকে দেশগঠনের শর্ত বলেছে। কিন্তু ইউরোপের ধারণার ব্যতিক্রম হিসেবে বারবার পেয়েছে ভারতবর্ষকে। ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন জনৈক ঐতিহাসিক, কারণ মতের বিভিন্নতাকে, বৈচিত্র্যকে মান্যতা দেওয়ার দর্শন ভারতবর্ষের বাইরে পাওয়া দুষ্কর।

কী মন্ত্রবলে এতো বড়ো দেশ 'এক অখণ্ড ভারত'-এ পরিণত হলো তা গবেষণা করতে ভারতবর্ষের উৎসবগুলো নিয়ে চর্চার প্রয়োজন, উৎসবগুলোর অংশ হয়ে উপলব্ধির প্রয়োজন— এ শুধু পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা জানা সম্ভব নয়।

সমগ্র ইউরোপ বিভিন্ন ভাষায় ভাগ হয়ে যেদিন আলাদা অনেকগুলো দেশ হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তারও হাজার হাজার বছর আগে ভারতের সমাজ-সংস্কারক, ত্যাগব্রতী ঋষিগণ ঐক্যের মন্ত্র এবং তা অনুশীলনের ক্ষেত্ররূপে এই উৎসবগুলোকে সমাজে প্রচলিত করেছিলেন।

কোনো এক কবির ভাষায় তাই বলতে হয় 'যত বিশ্ববাসী ছুটে আসবে কাছে, জানবে হেথায় কী যে মন্ত্র আছে'।

এই মন্ত্র ভারতবর্ষকে শত বিপদ, আক্রমণের মধ্যেও আপন সংস্কৃতিকে জাগ্রত রাখতে সাহায্য করেছে। উৎসবের স্নেহের বন্ধন, আকর্ষণ, ভাষার বিভিন্নতাকে, আঞ্চলিকতাকে উপেক্ষা করে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্নতাবাদের ভ্রূকুটি থেকে হাজার হাজার বছর ধরে রক্ষা করছে।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে,

'ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় নমোহস্তু পরমাত্মনে।'

'জ্যোতির্ময়স্বরূপায় বিশ্বমাঙ্গল্যমূর্তয়ে।।'

অদ্বৈতবাদীরা উপনিষদের পরমেশ্বরকে, ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। সচ্চিদানন্দ একটি সংস্কৃত সংমিশ্রিত শব্দ যা তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'সৎ' অর্থাৎ সত্য, 'চিৎ' অর্থাৎ চেতনা এবং 'আনন্দ' অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মবোধের ফলে ঐশ্বরিক আনন্দের অনুভূতি। আনন্দের অনুভূতির মাধ্যমে এই একাত্মতার উপলব্ধির অনুশীলনই হলো উৎসব। উৎসবের মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তির দ্বৈতসত্তার যেন বিলোপ ঘটে, ব্যক্তি যেন সমাজের সঙ্গে মিশে যায়।

ষোড়শ সংস্কার হিন্দুদের জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ষোলটি বহিরঙ্গ সংস্কার যা গর্ভস্থ অবস্থা থেকে শুরু হয়ে পরিণতি পায় অন্তিম সংস্কারে। বিভিন্ন প্রথা ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ এনে দেয়— ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এই যোগের চেষ্টা ব্যক্তির দিক থেকে থাকে, আর উৎসব হচ্ছে সমাজের সেই একমাত্র সংস্কার যেখানে সমষ্টির আহ্বান থাকে ব্যষ্টির প্রতি।

উৎসবের মাধ্যমে ব্যষ্টিকে সমষ্টির দিকে টেনে ভারতীয় সমাজ আপন শক্তির জাগরণ করে। ভারতবর্ষে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা একইসঙ্গে চলেছে। আপন উপাসনা পদ্ধতি জোর করে চাপিয়ে দেওয়াক প্রবণতা ভারতবর্ষে ছিল না, কারণ এই দেশ 'যত মত, তত পথ'-এর আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু যখন মূর্তিপূজার শাস্তি হিসেবে উপাসনা পদ্ধতির নামে অত্যাচার, নৃশংসতার শিকার হয়েছে ভারতীয় সমাজ সেই সময় মানসিক আঘাত থেকে বের হয়ে সমাজ স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে, নিজেদের মধ্যে ঐক্য ফিরে পেয়েছে উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর এমন কোনো সভ্যতা নেই, সমাজ নেই যেখানে সভ্যতার প্রবহমানতার পথে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর জন্য কিছু কুপ্রথা সভ্যতার গতিকে বাধা দিয়েছে— ভারতবর্ষ তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সামাজিক উৎসব ভারতবর্ষে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি বিকৃতিকে নিশ্চিহ্ন করতে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। ভারতীয় সমাজ যখন সমুদ্রপারের, সীমান্তের ওপারের লুটেরাদের থেকে নিজেদের বাঁচাতে প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা থেকে বিরত থেকেছে তখন উৎসব তাদের সংস্কার, উপাসনা, আধ্যাত্মিকতাকে অনুশীলন ও অনুভবের সুযোগ এনে দিয়েছে। মূর্তি পূজাকে বাধা দেওয়া যায় কিন্তু মহাজাগতিক ঘটনাবলীকে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ঈশ্বরোপাসনাকে কীভাবে বাধা দিবে? সেকথা তো কেতাবে উল্লেখই নেই।

সূর্যের উত্তরায়ণ অর্থাৎ উত্তরদিকে যাত্রা শুরুতেই 'মকর সংক্রান্তি' উৎসব হিসেবে পালিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে পৃথিবীর চারিদিকে সূর্যের আপাত গতিকে ১২টি রাশির মাধ্যমে ভাগ করা হয়— মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। প্রত্যেক রাশিতে সূর্য একমাস করে অবস্থান করে এবং ১ বছরে একটি পূর্ণচক্র সম্পাদিত হয়। শাস্ত্রে সূর্যের ১২টি নাম আমরা পাই— যোগে সূর্য নমস্কারের ক্ষেত্রে ১২টি অবস্থানে ১২টি নামে সূর্যকে প্রণাম করা হয়— মিত্র, রবি, সূর্য, ভানু, খগ, পূষন্, হিরণ্যগর্ভ, মরীচ, আদিত্য, সবিত্র, অর্ক, ভাস্কর।

মকর সংক্রান্তি সূর্যের ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে প্রবেশের সময়। পৃথিবীর তিন ধরনের গতির ফলে আকাশে সূর্যের অবস্থানের পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করে থাকি। পৃথিবীর নিজের অক্ষের চারিদিকে গতি অর্থাৎ আহ্নিক গতির জন্য সূর্যকে পূর্বদিকে উদয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত যেতে দেখি অর্থাৎ দিন ও রাত্রি হয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য দিন-রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন হয় এবং সূর্যকে আকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রসজ্জার সাপেক্ষে বিভিন্ন অবস্থানে দেখতে পাই। আকাশে সূর্যের এই অবস্থানকে চিহ্নিত করতেই পৃথিবীর চারিদিকে ১২টি রাশি দিয়ে ৩৬০°কে ভাগ করা হয়েছে।

পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ, কক্ষপথের তলের লম্বদিকের সাপেক্ষে ২৩.৫° কোণে হেলে থাকে। ফলে, আমরা সূর্যকে প্রতিদিন একজায়গা থেকে উদয় হতে দেখি না, উত্তর-দক্ষিণ বরাবর সরতে দেখি। উত্তর গোলার্ধে তথা ভারতবর্ষ থেকে দেখলে যেদিন সূর্য নিজেরে দক্ষিণতম অবস্থানে থাকে আর উত্তরদিকে যাত্রা শুরু করে সেই দিনটিকেই উত্তরায়ণ বলে। উত্তরায়ণের দিন উত্তর গোলার্ধে ক্ষুদ্রতম দিন আর দীর্ঘতম রাত্রি হয়। বর্তমানে উত্তর গোলার্ধে সেই দিনটি হয় ২১ ডিসেম্বর। কিন্তু সুপ্রাচীন প্রথানুযায়ী সূর্যের মকর রাশিতে প্রবেশের দিনটিকেই ভারতবর্ষে উত্তরায়ণ ধরা হয় এবং এই দিন দেশজুড়ে উদ্‌যাপিত হয় বিভিন্ন উৎসব। আর এরপর থেকে দিনের সময় বাড়তে থাকে এবং রাত্রির সময় কমতে থাকে। একইভাবে, সূর্য উত্তরদিকে সরতে সরতে যখন উত্তরতম প্রান্তে পৌঁছে যায় এবং দক্ষিণ দিকে তার যাত্রা শুরু হবার পালা, সেইদিনটিকে দক্ষিণায়ন বলা হয়। ভারতবর্ষে সেই দিনটি হয় ২১ জুন, সেই দিনে দীর্ঘতম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি হয়।

সূর্যের উত্তরায়ণ (দক্ষিণতম অবস্থান) থেকে দক্ষিণায়ন (উত্তরতম অবস্থান)-এ যাত্রার মাঝে এমন একটি দিন আসে যখন দিন ও রাত্রি সমান হয়; সেই দিনটিকে বলে মহাবিষুব বা বসন্তবিষুব (২০ মার্চ)। একইভাবে, দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণে সূর্যের যাত্রার মাঝে ২৩ সেপ্টেম্বর দিন ও রাত্রি সমান হয় যাকে জলবিষুব বা শারদীয় বিষুব বলা হয়। এইভাবে একটি বছরকে চারটি বিশেষ দিন বা বিন্দু দিয়ে ভাগ করা হয়েছে এবং বিশেষ দিনগুলিকে চিহ্নিত করতে বিভিন্ন উৎসবের প্রচলন হয়েছে। মায়া, ভারতীয় সভ্যতা এই ধরনের মহাজাগতিক ঘটনাবলীকে উৎসবের মাধ্যমে পালন করে আসছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে।

উত্তরায়ণ থেকে সূর্যের তেজ বাড়তে থাকে, দিনের দৈর্ঘ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কর্মচঞ্চলতা বাড়ে, দিনের আলোয় কাজের সময় বেশি পাওয়া যায়। কৃষক-শ্রমিক শীতের জড়তা কাটিয়ে নিজের শ্রমক্ষমতা ফিরে পায়, গাছ আবার পল্লবিত ও কুসুমিত হওয়ার পথে এগিয়ে

যায়। শীতকালে শীতজনিত যে সমস্ত শারীরিক সমস্যার মুখোমুখি আমরা হই সেগুলোও কমতে থাকে, মাঠে একটু বেশি খেলার সময় পাবে শিশু-কিশোরের দল।

পৃথিবীর প্রাণশক্তির উৎস সূর্য— আর এ যেন সূর্যেরই পুনর্জন্ম। তাই উত্তরায়ণ বা মকর সংক্রান্তি সূর্যোপসনার এক উত্তম সময়।

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২৪তম শ্লোকে বলা হয়েছে,—

'অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।।'

অর্থাৎ যে মার্গে জ্যোতির্ময় অগ্নির অধিপতি দেবতা, শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতা এবং উত্তরায়ণের ছয়মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন, সেই মার্গে মৃত্যু হলে ব্রহ্মবিদ যোগীগণ উপরিউক্ত দেবাদিগণের দ্বারা ক্রমশ নীত হয়ে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

উত্তরায়ণে সূর্যের এই সংক্রান্তিতে বিভিন্ন নদীতে পুণ্যস্নান, শাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ড ভারতবর্ষব্যাপী দেখতে পাওয়া যায়।

মকর সংক্রান্তি উৎসব থাইল্যান্ডে সোংক্রান, কম্বোডিয়ায় মহা সোংক্রান, মায়ানমারে থিংইয়ান, লাওসে পি মা লো নামে পালিত হয় যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তৃতিকে তুলে ধরে।

ঋগ্বেদে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৫তম সূক্তের পঞ্চম ঋক্‌টি হলো—

'বি জনাঞ্ছাবাঃ শিতিপাদো অখ্যন্ রথং হিরণ্য প্রউগং বহন্ত।

শশ্বদ্বিশঃ সবিতুর্দৈব্যস্যোপস্থে বিশ্বা ভুবনানি তস্থুঃ।।'

অর্থাৎ সূর্যরশ্মিজনিত হিরণ্যসদৃশ উত্তরদিকের অক্ষ ও শিশিরের নিম্নাখ্য— এই দুই অক্ষের মাঝেই পৃথিবীর সবকিছুই অবস্থানরত।

ঋগ্বেদের সময় থেকেই সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ গতির ধারণা ভারতবর্ষের ছিল। ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের ২২তম সূক্তের ১৮তম ঋকে বলা হচ্ছে, 'ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণু র্গোপা অদাভ্যঃ

অতো ধর্মাণি ধারয়ন্।।'

এবং (১।২২।২০।) ঋকে বলা হয়েছে,

'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ

দিবীব চক্ষুরাততম্।।'

এই দুটি ঋকে বিষ্ণুর বা সূর্যের তিনটি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এই তিন পদক্ষেপ একটি উত্তরায়ণ বিন্দুতে, একটি বসন্ত বিষুবে (জলবিষুব) এবং একটি দক্ষিণায়ন বিন্দুতে। শেষেরটি পরম পদ বলে বিবেচিত, কারণ এখান থেকেই সূর্যের দক্ষিণায়ন যাত্রা শুরু এবং বর্ষাকালেরও শুরু।

এইভাবে ঋগ্বেদ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণে সূর্যের গতি, বিশেষ অবস্থান এবং তার ফলে ঋতু পরিবর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায়। কখনো বসন্ত, কখনো বর্ষাকে বছরের শুরু হিসেবে ধরে কালপঞ্জী নির্মিত হয়েছে আর সূর্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে উদ্‌যাপন করা হয়েছে উৎসবের মাধ্যমে। এই উৎসবগুলি ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার প্রাচীনত্ব ও গুরুত্বকে তুলে ধরে। বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে মাহাজাগতিক ঘটনাবলীকে ঋগ্বেদ, বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতবর্ষ নাকি ইতিহাস লিখতে জানতো না। কিন্তু ভারতবর্ষ নিজের ইতিহাসকে পাথরে লিখেছে বিভিন্ন মূর্তির কারুকার্যে, রামায়ণ-মহাভারতে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে মহাজাগতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলিয়ে দিনক্ষণ পর্যন্ত এমনভাবে উল্লেখ করেছে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে— লৌকিক বিশ্বাস ও ভক্তির ফলে কিছু অতিরঞ্জন হয়েছে কিন্তু অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সিমুলেশেন সফট্‌ওয়্যার-সহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সত্য ইতিহাস বের হয়ে আসছে। আপন পুঁথির ঐতিহাসিকতা, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নিয়ে ইউরোপ আজ নীরব। কিন্তু বিজ্ঞান, আজ ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে নতুনভাবে চিনিয়ে দিচ্ছে।

ভারতবর্ষের ঋষিগণ এই কারণেই হয়তো যেকোনো ঘটনা উল্লেখের সময় বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহের অবস্থান উল্লেখ করেছেন এমনভাবে যেন তা কালের গর্ভে হারিয়ে না যায়। ফলে তা হারিয়ে যায়নি। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে আপন ভাষা থেকে দূরে সরেছে, নিজেদের ঐক্যসূত্র ভুলেছে, আপন ইতিহাস ভুলেছে কিন্তু উৎসবের মাধ্যমে আনন্দ উদ্‌যাপন করতে ভোলেনি। ফলে পরোক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভাষা, জাতীয়তার ঐক্যসূত্র বেঁচে থেকেছে। মহাকাল জানেন যেদিন ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক স্মৃতিসৌধগুলি একে একে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেদিন ভারতীয়দের মধ্যে বেঁচে থাকবে তাদের উৎসব আর নতুন প্রজন্ম। যখন তার কারণ বিশ্লেষণ করতে বসবে একে একে বেরিয়ে আসবে তাঁর আপন ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা। এইভাবে এক সনাতন সংস্কৃতি নিজেকে কালজয়ী করার রসদ উৎসবের মাধ্যমে নিজের মধ্যে জিইয়ে রেখেছে।

মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নের সঙ্গে পিতামহ ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু বরণ, গুরু গোবিন্দ সিংহের চল্লিশজন শিষ্যের বলিদান-সহ ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলী জড়িয়ে আছে। সেই ইতিহাসকে স্মরণ করে সমাজের স্ফূর্তি, আশা ও উদ্যমের মাধ্যমে আত্মশক্তি জাগরণের উৎসব— মকর সংক্রান্তি আশা ও উদ্যমের মাধ্যমে আত্মশক্তি জাগরণের উৎসব— মকর সংক্রান্তি। যুদ্ধে পরাজিত হলেও দেশের পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা ততক্ষণ জীবিত থাকে যতক্ষণ সেই দেশ আপন সংস্কৃতির বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে।

দেশ শুধুমাত্র একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী বা ভূমি নয়; দেশের ভিত্তি রচিত হয় সেই সংস্কৃতির মাধ্যমে যা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বন্ধন দৃঢ় করে সমষ্টিতে পরিণত করে, এমন এক সমাজ তৈরি করে যারা তাদের সংস্কৃতির মূর্ত রূপ আপন দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

সংস্কৃতির প্রতি গর্ব থেকে দেশের প্রতি গর্ব এবং সেই গর্বকে, সেই সাংস্কৃতিক পরিচয়কে বাঁচিয়ে রাখার চেতনার মধ্য থেকেই রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা এবং স্বাধীনতার অঙ্কুর প্রাণবায়ু লাভ করে। সাংস্কৃতিক চৈতন্য ব্যতীত রাষ্ট্রীয়তার বীজ কখনোই বৃক্ষে পরিণত হতে পারে না বা পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয়তা সেইদিন লুপ্ত হয়ে যায় যেদিন ছলনার দ্বারা ভ্রমিত হয়ে বা আপন সংস্কৃতির প্রতি অজ্ঞানতা থেকে জন্ম নেওয়া অনুকরণ প্রবণতা সাংস্কৃতিক চৈতন্যকে নষ্ট করে।

মকর সংক্রান্তি উৎসব পালনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা ও গৌরবময় ইতিহাসের উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত আছে এই উৎসব পালনের সার্থকতা। □

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে

আনন্দ মোহন দাস

সম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের মর্মান্তিক ঘটনা সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। মধ্যযুগীয় বর্বরতা এবং একবিংশ শতাব্দীতে অমানবিক অত্যাচারের জ্বলন্ত উদাহরণ হলো এই ঘটনা প্রবাহ। বাংলাদেশে প্রকাশ্যে উন্মত্ত জনতার সমক্ষে হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যা সারা পৃথিবীর মানুষকে বিচলিত করেছে। বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার সীমা ছাড়িয়ে জেহাদি শক্তির আস্ফালন দেখা গেছে। নিতান্ত গরিব পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম যুবককে মেরে প্রকাশ্যে গাছে ঝুলিয়ে পুড়িয়ে মারার ঘটনা সভ্য সমাজের কলঙ্ক। এমনকী জেহাদিরা জ্বলন্ত দেহের উপর আঘাত করে হিংস্রতার প্রদর্শন করেছে। এই যুবকের শিশু সন্তানকে পিতৃহারা করে তার পরিবার সংসারকে পথে বসিয়েছে।

প্রসঙ্গত দীপুচন্দ্র দাস বাংলাদেশের অত্যন্ত গরিব পরিবারের মুচি সম্প্রদায়ের যুবক। সে পরিবারে একমাত্র লেখাপড়া জানা ব্যক্তি। সে লেখাপড়া শিখে একটি টেক্সটাইল কারখানায় চাকরি করতো। দীপুচন্দ্র মুসলমানদের সঙ্গে কাজ করলেও হিন্দু হিসেবে সে বরাবরই তাদের ঈর্ষার কারণ ছিল। সম্প্রতি সে চাকরিতে প্রমোশন পেয়েছিল। হিন্দু বলেই কারখানার সহকর্মীরা তার প্রমোশনটা ভালোভাবে নেয়নি। অভিযোগ উঠেছে, ষড়যন্ত্র করে তার বিরুদ্ধে ইসলাম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাকে জেহাদিরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তার সহকর্মীরাই খুনি জেহাদিদের হাতে তাকে তুলে দিয়েছে। এই হলো বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমানের সৌহার্দ্যের পরিচয়। বাংলাদেশের জেহাদি শক্তি প্রতিদিন যেকোনো অজুহাতে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালিয়ে হিন্দু বিতাড়নের চেষ্টা করছে। সন্ত্রাস হত্যা, রাহাজানি ও হিন্দু মহিলাদের সম্ভ্রমহানির ঘটনায় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জেহাদি কার্যকলাপের নিত্যনতুন ঘটনা ঘটে চলেছে। এ ব্যাপারে মহম্মদ ইউনুস কাপুরুষতা ও অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আইনশৃঙ্খলা বলে কোনো বস্তু বাংলাদেশে অবশিষ্ট নেই। চরম অরাজকতা চলেছে। হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। বহুবছর ধরে বাংলাদেশের হিন্দুশূন্য করার গভীর চক্রান্ত চলেছে। জেহাদিরা বাংলাদেশে আন্দোলনের নামে হিন্দুহত্যার রাজনীতি করে চলেছে। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অপসারণের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের নামে বাংলাদেশে যে হিংসার আগুন জ্বালানো হয়েছিল তারা সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে।

জেহাদি ছাত্র নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বাংলাদেশে যা ঘটে চলেছে, তার সম্পূর্ণ দায় ইউনুস প্রশাসনের। তাঁর শাসনে হিংসা এখন একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বর্তমান প্রশাসন সংখ্যালঘু হিন্দুদের সুরক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হিংসা, মোল্লাবাদী কার্যকলাপ এবং সংখ্যালঘু হিন্দু নিপীড়নের ঘটনা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। হিংসার আগুনে জ্বলছে এখন বাংলাদেশ। গত ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের শরিয়তপুর জেলার এক হিন্দু ব্যক্তি খোকনচন্দ্র দাসকে কুপিয়ে পেট্রোল ঢেলে হত্যা করার চেষ্টা হয়। দীপুচন্দ্র দাস, অমৃত মণ্ডল, বজেন্দ্র বিশ্বাসের পর জেহাদিদের নিশানায় ৫০ বছরের খোকনচন্দ্র দাস। গত ৩ জানুয়ারি ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় এই হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীর। বেছে বেছে হিন্দু হত্যা করে মোল্লাবাদীদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। এমনকী মোল্লবাদীদের কোপে নতুন বছরে জন্মাষ্টমী ও সরস্বতী পূজার ছুটিও বাতিল করা হয়েছে। বাঙ্গালিরা যে ভাষা দিবস নিয়ে গর্ব করে থাকে, সেই ভাষা দিবসের ছুটিও বাতিল হয়েছে। মোল্লাতন্ত্রের দাপটে মেরুদণ্ডহীন ইউনুস সরকার নিজেদের আত্মসমর্পণ করেছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ছুটি বাতিল ও ধর্মীয় কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি করে জেহাদি কার্যকলাপ চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। এখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবন, জীবিকা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বিপন্ন করে মোল্লাবাদীরা হিন্দুদের বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করেছে এবং হিন্দু সম্পত্তি দখল করার ঘৃণ্য চক্রান্ত করে চলেছে।

এখানে আন্দোলন ও ভোটের নামে পুরো মাত্রায় ভারত-বিদ্বেষী প্রচার চলেছে। ভোট প্রচারে ভারতের বিরোধিতা করতে গিয়ে এক নেতা ভারতের চিকেনস্ নেক দখল করার হুমকিও দিয়েছেন। এই অঞ্চলটি ঘিরে রয়েছে তিনটি বিদেশি দেশ যথা ভুটান, নেপাল ও বাংলাদেশ। এই স্পর্শকাতর এলাকাটি দখল করে জেহাদিরা উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এ ব্যাপারে চীন ও পাকিস্তানের মদত রয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। ভারত সরকারকে এ বিষয়ে সতর্ক থেকে চিকেনস্ নেককে এলিফ্যান্ট নেকে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। নতুবা এই অঞ্চলকে বিপদমুক্ত করা খুবই কঠিন।

শেখ হাসিনার অপসারণের সময় বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি ছিল, আজকের দিনে তদারকি সরকার ইউনুসের আমলে সেখানে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। এমনকী বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের চেয়ে খারাপ অবস্থা বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছেন। সম্প্রতি ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মোল্লাবাদী শক্তিগুলি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করে সাম্প্রদায়িকতা জাগিয়ে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি নজরুলের স্মৃতিবিজড়িত ছায়ানট-সহ শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি ধূলিসাৎ করা হয়েছে। অনেক মনিষীদের মূর্তি ভাঙ্গা হয়েছে। অনেক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও সংগীত, নাটক একাডেমি জোর করে বন্ধ করে মোল্লাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছে। দৈনিক সংবাদপত্র 'প্রথম আলো ও ডেলি স্টারের' অফিসে হামলা

চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রথম সারির সংবাদপত্রের অফিসগুলিতে ব্যাপক হামলা, অগ্নিসংযোগ ও অবাধে লুটপাট চালিয়ে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টা হয়েছে।

বাংলাদেশ এখন জেহাদি ও মোল্লাবাদী কার্যকলাপের স্বর্গরাজ্য। বিনা বাধায় তারা সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা হিন্দু বিতাড়ন করে বাংলাদেশকে গাজায় রূপান্তরিত করে মোল্লাবাদ কায়েম করতে চায়। এরা যেকোনো ভাবে বাংলাদেশে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচন বানচাল করতে চায়। কারণ এরা নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ী সরকার দ্বারা গণতন্ত্র যাতে প্রতিষ্ঠা না হয় তার জন্য চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের এই সমস্ত জেহাদি কার্যকলাপ এবং সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করার সদিচ্ছা নেই বলে এই ধরনের ভারতবিরোধী শক্তিগুলি বিনা বাধায় তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পাকিস্তান সরকার ছদ্মবেশে এই সমস্ত জেহাদি শক্তিগুলিকে নানাভাবে মদত দিয়ে চলেছে। এখন পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই বাংলাদেশে অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে এবং নানা ভাবে ভারতবিদ্বেষী আন্দোলন জাগিয়ে তুলছে।

এখানকার জামায়াতি ও মোল্লাবাদী শক্তিগুলি পাকিস্তানের মদতে ভারতের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চাইছে। এবার ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আক্রমণের দুঃসাহস করলে নিজেদের অস্তিত্ব মানচিত্র থেকে মুছে যেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর চরম নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ-সহ আমেরিকার প্রতিবাদ ও হিংসা বন্ধ করার উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। ভারতের মধ্যে যারা নিজেদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, উদার, ধর্মনিরপেক্ষ ও সংখ্যালঘু সমাজের ধারক বাহক হিসেবে জাহির করেন, তারাও দীপুচন্দ্র দাসের মতো হিন্দু যুবকের নৃশংস হত্যায় বিস্ময়করভাবে নীরব রয়েছেন। গাজা, প্যালেস্তাইনের মানুষের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা অহরহ মিছিল করে প্রতিবাদ করে থাকেন, তারাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নীরবতা বজায় রেখেছেন। হয়তো মুসলমান ভোটের তাড়নায় প্রতিবাদ করার সাহস পাননি। বাংলা পক্ষ ও শাসক তৃণমূল যারা নিজেদের বাঙ্গালি সংস্কৃতির রক্ষক হিসেবে দাবি করে থাকেন, তারাও বাংলাদেশের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত ছায়ানটের ধ্বংসের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাননি। এমনকী বাংলাদেশের হিন্দু বাঙ্গালি যুবক দীপুচন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যার ঘটনায় কোনো প্রতিবাদ করার সাহস দেখাননি।

সেদেশের জেহাদি ও মোল্লাবাদী শক্তির দ্বারা সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোনো রকম আওয়াজ তোলেননি। রবীন্দ্রনাথ-সহ সমস্ত বাঙ্গালি মনিষীদের স্মৃতিবিজড়িত সমস্ত স্মারকগুলি বাংলাদেশে আজ পরিকল্পিতভাবে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির ময়দানে শাসক তৃণমূল ও বামপন্থীরা রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর-সহ বাঙ্গালি মনিষীদের নাম নিয়ে যে ধরনের বাঙ্গালি অস্মিতার কথা বলে থাকেন এবং রাজ্যে বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষা বিপন্ন বলে দাবি করেন, তাঁরাও বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে বিস্ময়করভাবে চুপ রয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাস এবং মুর্শিদাবাদের হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের নৃশংস হত্যা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এগুলি জেহাদি ও মোল্লাবাদী শক্তিগুলির পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে এলাকা হিন্দু শূন্য করার ষড়যন্ত্র। এই ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের গোপন প্রয়াস। কিছুদিন আগে চিন্ময় প্রভুর মতো বৈষ্ণবকে মিথ্যা অভিযোগে সুপরিকল্পিতভাবে জেলবন্দি করে রাখা হয়েছে। কারণ তিনি হিন্দুদের প্রতিবাদী মুখ হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু আজও তিনি মুক্তি পাননি। বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থা মোল্লাতন্ত্রের হাতে চলে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গেও তোষণ নীতির ফলে আজ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জেহাদি ও মোল্লাবাদী শক্তিগুলি নানা ভাবে সক্রিয় রয়েছে। তার সাম্প্রতিক নিদর্শন হলো মেদিনীপুরের একটি বেসরকারি স্কুলের অনুষ্ঠানে গায়িকা লগ্নজিতার 'জাগো মা' গানটি বন্ধ করে সেকুলার গান গাওয়ার জন্য শাসকদলের সংখ্যালঘু নেতা দ্বারা শিল্পীর উপর হামলা। গায়িকা মধুবন্তী মুখার্জি ও একজন কীর্তনীয়া শিল্পীর উপরও হামলার চেষ্টা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে মোল্লাবাদীদের দাপটে শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা শুর হয়ে গেছে। সবকিছুতেই বাংলাদেশের ছায়া দেখা যাচ্ছে। যাঁরা ব্রিগেড ময়দানে চিকেন প্যাটিস কাণ্ডে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন, তাঁদের আজ দেখা যায় না কেন? এটাই কি সেকুলারিজমের নমুনা। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের দিনে সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধেও কোনো প্রতিবাদ করার সাহস দেখান না।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কিছু জায়গায় মোল্লাবাদী শক্তিগুলি দুর্গাপূজায় মাইক, শাঁখ ও ঢাক বাজানোর নির্ঘণ্ট জারি করতে আরম্ভ করেছে। মেটিয়াবুরুজে তুলসী মঞ্চ ভেঙে দিয়ে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে মুসলমান মোল্লাবাদীরা কোনো কোনো স্কুলে আজকাল সরস্বতী পূজা করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গেও জেহাদি শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। রাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে কিছু রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয়ে সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের একটি অংশ এই ধরনের অন্যায় কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এখানেও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর একই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। তাই সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতজী রাজ্যের বর্তমান সমস্যা সমাধানে যথার্থভাবেই হিন্দু ঐক্যের কথা বলেছেন। বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করতে সেখানকার হিন্দু সমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন এবং হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুদের পাশে দাঁড়াবার জন্য ভারত-সহ সারা বিশ্বের হিন্দুদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। □

বাংলাদেশে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ সত্যিই অন্ধকার

সুভাষ চক্রবর্তী



সাহিত্যিক বনফুল লিখেছেন, 'পদ্মা পারে মার খেলি তুই/ গঙ্গাপারেও খেলি,/ ব্রহ্মপুত্রের কূলেতে তুই রক্তে ভেসে গেলি।/ বৈতরণীর পারে এবার, /কী হবে তোর হাল,/ অন্তরীক্ষে বসে তাহা,/ ভাবছে মহাকাল।' দুর্বল নেতা, দুর্বল নীতি, পরাধীনতার কারণে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে দেশভাগ। ভারত বিভাজনের ভবিষ্যৎ পরিণতি কী হতে পারে সে ভাবনা অধিকাংশ নেতার মাথায় ছিল না। চমকে দেওয়া রাজনীতির পসরা সাজিয়ে কেটে গেল ৭৮টি বছর। যে সমস্যার জন্য দেশভাগ হলো, সেই সমস্যার সমাধান হলো কোথায়? আরও কতদিন চলবে এই অন্যায় অবিচার? নির্যাতনের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত খণ্ডিত অংশের ভারতীয় কৃষ্টির ধারক বাহক মানুষরা। এক ভারত এখন ত্রিখণ্ডিত। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক অংশ গণপ্রজাতন্ত্রী ইসলামিক পাকিস্তান। ভারতের পূর্ব দিকের অপর অংশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ যার স্টেট রিলিজিয়ন— ইসলাম। শব্দের সামান্য পার্থক্য থাকলেও দু'টি দেশেরই লক্ষ্যস্থল এক। অবশিষ্ট ভারত 'সেকুলার'। সেকুলারিজমের অন্তরালে বিদেশি মতবাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করাই একমাত্র লক্ষ্য।

দ্বিজাতীতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের জন্য দায়ী করা হয় ব্রিটিশ অনুপ্রবেশকারীদের। এই যুক্তি কি সম্পূর্ণ সত্য? ব্রিটিশ শাসনের আগে প্রায় ৫৫০ বছর পরাধীন ভারতবর্ষ শাসিত হয়েছে বহিরাগত মুঘলদের দ্বারা। এই সময় প্রায় ৯৬ হাজার মন্দির ধ্বংস হয়েছে তাদের আক্রমণে। ধ্বংস হয়েছে ভারতীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন। লুণ্ঠিত হয়েছে ধনরত্ন। এরাই ভারতভূমে প্রথম আমদানি করেছে সাম্প্রদায়িকতা। এই বিষবৃক্ষের বীজ থেকে অঙ্কুরিত গাছ বর্তমানে মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। এই গাছের চারটি কাণ্ড— সেকুলারিজম, জেহাদ, ধর্মান্তরণ ও সন্ত্রাস। বর্তমানে 'পাকিস্তান' হয়ে ওঠা বাংলাদেশ অঘোষিতভাবে জাতীয়করণ করেছে সন্ত্রাসবাদ। ভারতের ভিতর ও বাইরে থেকে এই চারটি কাণ্ডের সমর্থন ছাড়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কার্যত অচল। বিদ্বেষবাদের আগুনে পুড়ছে ওই দেশে বসবাসকারী হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও জনজাতি সমাজ। লুণ্ঠিত হচ্ছে তাদের বাড়ি-ঘর। জাল দলিলের মাধ্যমে জবরদখল হয়ে যাচ্ছে শ্মশান, দেবোত্তর সম্পত্তি, কৃষি জমি, বসত ভিটার জমি ও ব্যবসায়িত প্রতিষ্ঠান। ধর্ষণ ও অপহরণের শিকার অসংখ্য সংখ্যালঘু নারী। ইসলাম অবমাননার অজুহাতে ৮০ জন হিন্দুকে করা হয়েছে কারারুদ্ধ। চাকরিচ্যুত করা হয়েছে শতাধিক হিন্দুকে। হিন্দুদের ১৬.৮ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি শত্রু সম্পত্তি আইনের গ্রাসে। ১০ লক্ষ একর দেবোত্তর সম্পত্তি এখন লুঠের মাল। প্রতিদিন চলছে বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে আগুন ও ধ্বংস। প্রকাশ্যে মন্দিরের সম্মুখে চলে গোরু জবাই। জীবন্ত অবস্থায় হিন্দুদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা এখন প্রতিদিনের ঘটনা। ভাঙচুর হচ্ছে সংবাদপত্রের অফিস, সাংবাদিকদের বাড়িঘর। কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে সাংবাদিকদের। বাংলাদেশ জুড়ে এখন মোল্লা তন্ত্রের আস্ফালন বলে কথা! ইবলিশরা উত্তর-পূর্ব ভারত দখলের খোয়াবে বিভোর। সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশে জেহাদিদের সঙ্ঘবদ্ধ, হিংস্র আক্রমণে ২৯৩ জন নিহত বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। তৌহিদি জনতার সংগ্রামের নামে জেহাদি বাহিনীর নির্লজ্জ তাণ্ডব নৃত্য। বাংলাদেশে এখন গানবাজনা হারাম। জেহাদিদের হাতে নির্যাতনের শিকার ৩৮১ জন সাংবাদিক। আইনের শাসন ফেরাউনদের হাতে। মানব কল্যাণ ও মানব বিকাশ এখন নাউজুবিল্লাহ।

পূর্বপাকিস্তানের জনমানসে স্বাধীনতার বীজ প্রথম রোপণ করেছিলেন ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সংসদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাষ্ট্রভাষা 'বাংলা'র দাবি নিয়ে করেছিলেন লড়াই। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন স্বপন চৌধুরী। স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নির্মাণ করেছিলেন শিবনারায়ণ দাস। স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম বীরগতিপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা জগজিৎ দাস। বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক 'শালুক ফুল' পরিকল্পনা করেছিলেন মেহেরপুরের এক হিন্দু যুবক। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন রাজধানী মুজিবনগর গঠন করা হয়েছিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় শতাধিক বিঘার আমবাগানে যা ছিল হিন্দু সম্পত্তি। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এই আমবাগানে মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কম্পিত করেছিল দেশভাগে বলি সহস্রাধিক হিন্দু শরণার্থী। এই শরণার্থীরা ছিল নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার বেতাই, লালবাজার, আস্তল্ল নগর গ্রামের বাসিন্দা। মাইক, স্টেজ মাথায় করে জীবন বাজি রেখে প্রায় দু'কিলোমিটার দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করে সেদিন এই হিন্দুরা সফল করেছিল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তার মধ্যে ৯৫ লক্ষ ছিল হিন্দু। দু'লক্ষ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের মধ্যে দেড় লক্ষ ছিল হিন্দু। হাজার হাজার কোটি টাকার হিন্দুদের সম্পদ হয়েছে লুঠ ও ভস্মীভূত। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার বাহিনীর হাতে প্রাণ হারানো ৩০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ২৫ লক্ষ হিন্দু। যুদ্ধের সময় এবং পরবর্তী পর্যায়ে নানা খাতে ভারত সরকারের কোষাগার থেকে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। অসংখ্য বীর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও ভারতীয় সেনার বলিদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম। সেই মহান অবদান আজ ম্লান।

ভূমিপুত্র হিন্দুরা আজ সেই দেশে উৎপীড়িত, বিতাড়িত, অধিকারহীন; হিংস্র হায়নার খাঁচায় বন্দি। সম্মুখে তাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ! একমাত্র শ্রীভগবানই জানেন তাদের অদৃষ্টে কী রয়েছে। □

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১৯২০ সালের একটি দিন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে উপচে পড়া ভিড়। জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত, কৃতী ছাত্র-ছাত্রী, এবং শহরের গণ্যমান্য মানুষের উপস্থিতিতে মুখরিত চারদিক। একজন বিরাট বিজ্ঞানীকে সংবর্ধনা জানানো হবে। তিনি শুধু বিজ্ঞানী নন, তিনি গবেষক, তিনি স্বদেশপ্রেমিক। সেই সঙ্গে ছাত্র সমাজের অতি প্রিয় একজন অধ্যাপক।



দূরদূরান্ত থেকে সবাই এসেছেন তাঁর বক্তৃতা শোনার আশায়। তাঁর কথা শুনে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে ফিরে যাবেন তারা। এমনই প্রভাব ছিল তাঁর। সভাকক্ষে তিল ধারণের জায়গা নেই। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন, কখন আসবেন তাদের নিরভিমানী, নিরহংকারী প্রিয় মানুষটি।

হঠাৎই ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন এক অতি সাধারণ চেহারার রোগা একটি মানুষ। মাথায় উসকোখুশকো ছুল, পরনে মোটা খদ্দরের ধুতি, গায়ে টুইলের হাফশার্ট। তার উপর অতি সাধারণ কাপড়ের গলাবন্ধ কোট। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। এক হাতে বাঁশের বাঁটের সাধারণ ছাতা। অন্য হাতে কাগজপত্রে ভর্তি একটি ফাইল।

মুহূর্তেই সমবেত জনতার কণ্ঠে উঠল উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি। দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান হলো। দর্শন পাওয়া গেল প্রখ্যাত গবেষক, অধ্যাপক ও রসায়নবিদ— যিনি প্রথম ভারতীয় রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা— আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

যাঁরা তাঁকে চিনতেন না, তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক। এত বড়ো মাপের একজন বিদ্বান মানুষের এমন অনাড়ম্বর জীবনযাপন কেন? বাস্তবেই তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সাধারণ। মাত্র চল্লিশ টাকা খরচ করে তাঁকে মাস চালাতে হতো। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর মাসিক আয় তখন হাজার টাকারও বেশি। এনিয়ে কেউ কোনো অভিযোগ করলে তিনি হাসতে হাসতে বলতেন, এই তো বেশ ভালোই আছি। আরাম ও বিলাসিতা মানুষকে অক্ষম, অথর্ব ও অলস করে তোলে।

তাহলে বাকি টাকাগুলো কোথায় যেত? সেগুলো পৌঁছে যেত অগণিত ছাত্র-ছাত্রী, বিদ্যালয়, পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, গরিব-দুঃখী এবং নানা সেবাসমিতির ঠিকানায়। সাহায্যপ্রার্থীদের তালিকাও ছিল দীর্ঘ— তারা যারা নিয়মিত তাঁর কাছে থেকে সাহায্য পেত।

এমনই উদার, মানবিক ও সহজ সরল এই মহান বিজ্ঞানীর নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ নামক একটি শিল্প স্থাপন করেন। কালক্রমে এই কোম্পানি দেশের বৃহত্তম রাসায়নিক উৎপাদকের অন্যতম হয়ে দাঁড়ায়। তিনি দেশে রাসায়নিক শিল্পের জনক বলে পরিচিত। তিমি সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতেন। প্রয়োজনের বাইরে একপয়সাও খরচ করতেন না। তাঁর রচিত 'দ্য হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' গ্রন্থটি বিজ্ঞানীদের কাছে একটি অমূল্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

—সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

ইন্দরকিল্লা



ইন্দরকিল্লা জাতীয় উদ্যান হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলায় অবস্থিত। এটি ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর আয়তন ১০৪ বর্গকিলোমিটার। এটি ট্রান্স হিমালয় অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এই উদ্যানের মধ্যে দিয়ে ব্যাসনদী প্রবাহিত হয়েছে। এই উদ্যানে মিশ্র শঙ্কুযুক্ত বন (মিক্সড কোনিফেরাস ফরেস্ট), আলপাইন চারণভূমি এবং ওক বন রয়েছে। এখানকার প্রধান বৃক্ষ হলো জুনিপার, রডোডেনড্রন, স্প্রুস, ফার, আখরোট ও ম্যাপল্। বন্যপ্রাণীর মধ্যে রয়েছে চিতাবাঘ, তুষার চিতাবাঘ, হিমালয়ান বাদামি ভালুক, হিমালয়ান তাহের ও কস্তুরী হরিণ। রয়েছে ২৫০ প্রজাতির পাখি।

এসো সংস্কৃত শিখি-৯৬

উপরি (উপরে)

উৎপীঠিকায়া: উপরি মার্জনী অস্তি।
টেবিলের উপরে ডাস্টার আছে।

অভ্যাসং কুর্ম: –
বৃক্ষস্য উপরি বানরা: সন্তি।
মেঘস্য উপরি বিমানমার্গ: অস্তি।
মস্তকস্য উপরি টোপিকা অস্তি।

প্রযোগং কুর্ম: –
উপরি দ্বারা বাক্যাণি রচযাম:।
(উপরি দ্বারা কতকগুলি বাকা রচনা করবো)

ভালো কথা

আমার দেওঘর ভ্রমণ

এবার পরীক্ষা শেষ হলে গত ২১ ডিসেম্বর আমরা ১৪ জন মিলে দুটো গাড়িতে ঝাড়খণ্ডের দেওঘর দর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা একটি হোটেলে উঠেছিলাম। সেখানে খাবার খেয়ে ত্রিকূট পাহাড়ে উঠে মন্দির দেখলাম। মন্দিরে তিলক লাগিয়ে ঝরনায় হাত-পা ধুলাম। সেখানে আনেক বাঁদর ছিল। হোটেলে রাত্রিবাস করে পরদিন বাবা বৈদ্যনাথ মন্দিরে গেলাম। মা, জেঠিমা, রুমিপিসি, দিয়াবৌদি মন্দিরে পূজা দিতে গেলেন আর ততক্ষণে আমি, দাদা, বোন পুরো মন্দির চত্বর ঘুরে ঘুরে দেখলাম। তারপর সবাই মিলে একটু দূরে তপোবন পাহাড়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গুহার মধ্যে দিয়ে নীচে নেমে সব ঘুরে ঘুরে দেখে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম।

কর্ণিক কুমার নাথ, চতুর্থশ্রেণী, নালাগোলা, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

শীত

অনুরাধা মণ্ডল, অষ্টমশ্রেণী, ফারাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ

শীত পড়েছে বেশ জাঁকিয়ে
সঙ্গে হিমেল হাওয়া,
সারাদিনই জবুথবু
মাথায় উঠেছে যাওয়া।
শীতের চোটে ঠাকুমা আমার
কাঁপছে থরো-থরো,
কাঁপছে সব কুকুর বেড়াল
হয়েছে মরো-মরো।

কলকাতাতেও এত শীত
রাস্তাঘাট ফাঁকা
রাত আটটা হলে পরেই
বন্ধ গাড়ির চাকা।
শীতকালটা খুবই ভালো
যদিও এত শীত তো নয়,
এত শীতে গরিবদের যে
খুবই কষ্ট হয়।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550, Fax +91 33 2373 2590
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

বিশ্বমানবতার সুরসাধক ভূপেন হাজারিকা এক কিংবদন্তী



মিঠুন রায়

বিশ্বমানবতার প্রতীক ভূপেন হাজারিকা মূলত এক সংগীত সূর্য। তিনি সুধাকণ্ঠ তথা অনন্য সুরকার। বরাবরই সংগীত জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল যার জীবন। তাঁর কণ্ঠে যেমন ছিল ব্রহ্মপুত্রের উদ্দামতা, তেমনি ছিল গঙ্গা-পদ্মার শান্ত সমর্পণ। তাঁর মূল শক্তি ছিল কণ্ঠ। কণ্ঠ সংগীতের মাধ্যমেই তিনি শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের নয় গোটা ভারতবর্ষের জনগণের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শিল্পকে তিনি শুধু বিনোদনের উপকরণ হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন সমাজ পরিবর্তনের অমোঘ অস্ত্র হিসেবে। ভূপেন হাজারিকা ছিলেন একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, চলচ্চিত্র পরিচালক, লেখক ও চিন্তাবিদ।

ভূপেন হাজারিকার জন্ম ১৯২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর অসমের তিনসুকিয়া জেলার সদিয়ায়। বাবা নীলকান্ত হাজারিকা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। মা শান্তিপ্রিয়া হাজারিকা। দশ ভাই-বোনের মধ্যে ভূপেন হাজারিকা ছিলেন বড়ো। এক অনন্য সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে তিনি বড়ো হন। মা-বাবা উভয়েই সন্তানদের মধ্যে শৈশব থেকেই সংগীত-সংস্কৃতির বীজ বুনতে আগ্রহী ছিলেন। গোটা পরিবারে সংগীতচর্চার পরিবেশ ছিল। বাবা নীলকান্ত হাজারিকা পরবর্তী সময়ে রাজস্ব বিভাগেও চাকরি করেছেন। তিনি শঙ্করদেবের বৈষ্ণব গান সুর করে গাইতেন। মা শান্তিপ্রিয়া দেবীও নিয়মিত ব্রাহ্ম সংগীতের চর্চা করতেন। ভাবতে অবাক লাগে যে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে বালক ভূপেন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়েছিলেন। আর দশ বছর বয়সে তিনি নিজে গান লিখে সুর দিয়েছেন। ১৯৩৯ সালে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার অসমীয় চলচ্চিত্র 'ইন্দ্রমালতী'তে শিশুশিল্পী হিসেবে দুটি গানে কণ্ঠ দিয়ে তার সংগীত জীবনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। তখন ভূপেন হাজারিকার বয়স মাত্র বারো। তেজপুরে থাকার সময় সংগীতগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার মাধ্যমে ভূপেন হাজারিকা তাত্ত্বিক বক্তা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রিকায় তাঁর লেখা গান নিয়মিত ছাপা হতো।

১৯৪০ সাল, তেজপুরে মাধ্যমিক পাশ করে আইএ পড়তে গুয়াহাটি চলে আসেন। ১৯৪২ সালে কটন কলেজ থেকে আইএ পাশ করে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়তে ভর্তি হন। ১৯৪৪ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ এবং ১৯৪৬ সালে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। প্রকৃতঅর্থে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। ১৯৪৯ সালে সরকারি বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস কমিউনিকেশনে পিএইচডি করেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় শোষিত নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর বরাবর যার কণ্ঠে ধ্বনিত হত—সেই বিশ্ববন্দিত শিল্পী পল রবসনের সান্নিধ্যে আসেন তিনি। ভূপেন হাজারিকা নিজের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটানোর একটা সুযোগ পেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ফাঁকে রাতে লুকিয়ে রবসনের জেফারসন গুপ্ত স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্স ইনস্টিটিউটে ক্লাস করতেন, সেখানে পল রবসন মিউজিক বিষয় পড়াতেন। আসলে ওই সময় পল রবসনের বড়ো প্রভাব তাঁর জীবনে পড়েছিল। পল রবসনের সান্নিধ্যেই তিনি অনুভব করেন যে, শিল্পীর দায়বদ্ধতা শুধু শিল্পের প্রতি নয়, সমাজের প্রতিও। এই দর্শন থেকেই তিনি পরবর্তী সময়ে সৃষ্টি করেন তাঁর বিখ্যাত গান—'মানুষ মানুষের জন্য'। ১৯৫২ সালে ভূপেন হাজারিকা গণজ্ঞাপন বিষয়ে পিএইচডি করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা।' বছর দেশে ফিরে আসার পর কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বলে তাঁকে তৎকালীন অসম সরকার দু'বছর গান গাইতে দেয়নি। এমনকী বিহু অনুষ্ঠানও করতে দেয়নি। ১৯৫৪ সাল গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনায় যোগ দেন। তখন তাঁর সাক্ষাৎ হয় গণনাট্য সঙ্ঘের তদানীন্তন সম্পাদক (অসম রাজ্য) গণনাট্য শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রচেষ্টায় ১৯৫৫ সালে ভূপেন হাজারিকার প্রথম গানের

ফ ঃ ৬

সংকলন 'জিলিকন লুইতের পার' নামে গ্রন্থটি অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত হয়। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময়ে বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহার আমন্ত্রণে হেলসিঙ্কিতে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন ভূপেন হাজারিকা। গণনাট্য সঙ্ঘের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুবাদে তিনি ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সদস্যও নির্বাচিত হন। এমনকী যশ চোপড়া, বিজয় আনন্দ, বিজয় তেণ্ডুলকর, টি এস রঙ্গা, গৌতম ঘোষদের মতো চিত্রপরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পান।

ভূপেন হাজারিকা তাঁর গানে সমাজের অসাম্য, বৈষম্য ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 'বিস্তীর্ণ দুপারে', 'হে দোলা হে দোলা', 'গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা' বা 'আজ জীবন খুঁজে পাবি' প্রতিটি গানেই ধ্বনিত হয়েছে সামাজিক ন্যায়ের কথা। তিনি অসমীয় ও বাংলা, দুই ভাষাতেই সমান স্বাচ্ছন্দ্যে গান লিখেছেন, সুর করেছেন এবং গেয়েছেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো কীর্তি হলো তিনি অসমের লোকসুরকে বঙ্গের আঙিনায় এবং বঙ্গের ভাবধারাকে অসমের জনমানসে পৌঁছে দিয়ে এক অখণ্ড সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রচনা করেছেন।

ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতেও তাঁর অবদান নেহাত কম নয়। একসময় তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে হেমন্ত-ভূপেন প্রোডাকশন তৈরি করে 'নীল আকাশের নীচে' নামে একটি ছবি তৈরির উদ্যোগ নেন। কিন্তু কিছুদিন পর অজ্ঞাতকারণে প্রোডাকশনের নাম বদলে হয় 'হেমন্ত বেলা প্রোডাকশন'। আর পরিচালক হন মৃণাল সেন। এ ঘটনায় অবশ্য ভূপেন হাজারিকা ভেঙে পড়েননি। কিছুদিন পর স্ব-উদ্যোগে সাড়া জাগানো ছবি 'মাহুত বন্ধুরে' নির্মাণ করে নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় দেন।

তিনি বরাবরই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছিলেন। ১৯৬০ সালে দাঙ্গায়বিধ্বস্ত অসম। তিনি অসমে দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কিংবদন্তী শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে দাঙ্গাবিধ্বস্ত অসমে শান্তিযাত্রা করেন। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার অসারতা নিয়ে সাধারণ জনগণকে সচেতন করেন। তিনি আক্ষরিক অর্থে একজন সফল সুরকার ছিলেন।

১৯৬৫ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত টানা পনেরো বছর 'আমার প্রতিনিধি' নামে অসম থেকে একটি পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকায় তিনি উগ্র অসমীয়া জাতীয়তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অসম শুধু অসমীয়াদের নয়—অসম অসমে বসবাসকারী সকলের। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় উল্লেখ করেছেন যে, এক সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির কোনো বিরোধ হয় না। সংস্কৃতি ও দুষ্কৃতীর মধ্যে বিরোধ হয়। তিনি শ্রদ্ধা করতেন গান্ধীজীকে। আবার কমিউনিস্ট লেনিনের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা ছিল। 'আমার প্রতিনিধি'র এক সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছেন, 'গান্ধীর সংগ্রাম সুদীর্ঘ নদী। লেনিনের সংগ্রাম আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণে পৃথিবী কাঁপিয়েছে।' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্বাগত জানিয়ে তিনি লিখেছেন—

'জয় জয় নবজাত বাংলাদেশ
জয় জয় মুক্তিবাহিনী।'

ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের একাত্মতার পরিচয় হিসেবে তাঁর রচিত আর এক কালজয়ী গান—'গঙ্গা আমার মা / পদ্মা আমার মা।'

অসমীয়া চলচিত্রকে তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করেছিলেন। তাঁর পরিচালিত 'এরা বাটর সুর' (১৯৫৬), 'শকুন্তলা' (১৯৬১), 'প্রতিধ্বনি' (১৯৬৪), 'লটিঘটি' (১৯৬৬) অসমীয়া চলচ্চিত্রের মাইলফলক। শকুন্তলা চলচ্চিত্র ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রপতি পদক লাভ করে। অন্যদিকে রুদালি চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনার জন্য শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ভূপেন হাজারিকার রাজনৈতিক অঙ্গনে পদার্পণ ছিল কার্যত জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য। ১৯৬৭-৭২ সাল পর্যন্ত তিনি অসম বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৪ সালে অবশ্য বিজেপি প্রার্থী হিসেবে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। যদিও পরাজিত হন। ১৯৯৮-২০০৩ সাল পর্যন্ত সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি অসম সাহিত্য সভার সভাপতি হন।

ভূপেন হাজারিকা অগণিত পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৭৭ সালে লাভ করেন পদ্মশ্রী। ১৯৯২ সালে দাদাসাহেব ফলকে পুরস্কার দিয়ে তাকে সম্মানিত করা হয়। ২০১২ সালে পদ্মবিভূষণ। ২০১৯ সালে তাঁর পালকে যুক্ত হয় ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'ভারতরত্ন' (মরণোত্তর)। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ২০১১ সালে 'যুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মান' প্রদান করে।

২০১১ সালের ৫ নভেম্বর সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজারিকার জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু ভূপেন তাঁরর মৃত্যু নেই। কারণ, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান, একটি আন্দোলন, একটি দর্শন। তিনি শুধু অসমের গর্ব নন, সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক বিবেক। কেননা, তিনি তাঁর শিল্পের মাধ্যমে বিশ্বদরবারে মানবতাকে মহিমান্বিত করেছেন। তাঁর বিশাল সৃষ্টিসম্ভারকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তা সত্যিকারের অর্থেই আনন্দের বিষয়। ভাবতে অবাক লাগে যে, তাঁর জীবনী ২৩টি ভাষায় অনূদিত হচ্ছে এবং তাঁর জীবনীকে কেন্দ্র করে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

ভূপেন হাজারিকা অসমের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসে বঙ্গ তথা ভারত তথা বিশ্বজয় করলেন শুধুমাত্র তাঁর সাংস্কৃতিক মনীষা দিয়ে। বহুধাবিভক্ত সমাজব্যবস্থাকে তিনি গানের মাধ্যমে সূত্রবদ্ধ করেছেন। তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল 'একাত্মতাবোধ'। তাঁর প্রত্যেকটি গানেই অবশ্য একাত্মতার বার্তা ফুটে উঠেছে। জন্মশতবর্ষে তাঁর অমোঘ সৃষ্টি গান, সুর বা কাজ আমাদের মনে করিয়ে দেয়—মানুষের ওপরে তাঁর আর কোনো পরিচয় নেই। বিশ্বমানবতার দূত ভূপেন হাজারিকার গান যেন সীমানা ভেঙে অন্যদেশের মানুষের মনে মিশে গেছে। আর এ কারণেই হয়তো-বা তাঁকে কোনো ধরনের সীমা দিয়ে আবদ্ধ রাখা যায় না।

(জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

পাকিস্তানের পরাজয়ের চিহ্ন মুছে ফেলতে নিরলস কাজ করছেন ড. ইউনুস

যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে মোল্লাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সেই সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব বাংলাদেশের মাটি থেকে মুছে দিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছেন নোবেল শান্তি বিজয়ী ড. ইউনুস।

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। ছায়ানটের মতো সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান সবসময় পাকিস্তানের নিশানায় থাকবে এটাই স্বাভাবিক। পাকিস্তানি আমলে বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল ষাটের দশকের গোড়ার দিকে, যখন জাতি স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লিগের ভরাডুবির পর রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগৎ পাকিস্তান সরকারের নিশানায় চলে আসে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ব্যাপক আয়োজন উদ্‌যাপনের পর এই আয়োজনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁরা পাকিস্তান সরকারের নিশানায় চলে আসে। এই উদ্‌যাপনের পেছনে ভারতের হাত আবিষ্কার করা হয়। কিন্তু তাতে সংস্কৃতিকর্মীরা মাথা নোয়াননি। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁরা আরও সঙ্ঘবদ্ধ হন, প্রতিষ্ঠাতা করেন 'ছায়ানট'। পাকিস্তান সরকার বাঙ্গালিদের এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মূলে খুঁজে পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে। ১৯৬৭ সালে নিষিদ্ধ করা হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত। আপামর বাঙ্গালি গর্জে ওঠে। রাজনৈতিকভাবে প্রবল প্রতিবাদের মধ্যে সংস্কৃতি কর্মীরাও আন্দোলনে শামিল হন। নেতৃত্ব দেন 'ছায়ানট'-এর সংগঠকরা। অবশেষে পাকিস্তান সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়। 'উদীচী'র জন্মও ষাটের দশকে, বাঙ্গালির স্বাধীনতা যাত্রায়। সাধারণত গণসঙ্গীত পরিবেশন করে উদীচী। এই দুই প্রতিষ্ঠান ষাটের দশকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচন এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচিত আওয়ামি লিগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান রাজি না হওয়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষকেই শুধু হত্যা করেনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবাদী শিক্ষক, কবি-সাহিত্যিক- সাংবাদিক ও সংস্কৃতি কর্মীদেরও হত্যা করে। গুঁড়িয়ে দিয়েছিল বাঙ্গালির ঐতিহ্যের প্রতীক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও। এ ব্যাপারে তাদের সহযোগী ছিল জামায়াতে ইসলামি ও অন্যান্য ইসলামি দল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য-সহ লে. জেনারেল নিয়াজি ঢাকায় তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করেন ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে ১৬ ডিসেম্বর। এই দিনটি বাংলাদেশে বিজয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। আত্মসমর্পণের ঠিক দুদিন আগে অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্দেশে তাদের সহযোগী জামায়াতে ইসলামির বিভিন্ন ঘাতক বাহিনী যেমন রাজাকার, আল বদর, আল শামস দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের যাঁরা ভারতে না গিয়ে ঢাকায় ছিলেন তাঁদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে রায়েরবাজারে একে একে হত্যা করে। স্বাধীন বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতেই এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশে পরাজিত পাকিস্তানের দোসরদের সেভাবে কোনো বিচার হয়নি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সিমলায় ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলেও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। এদিকে পরাজিত ইসলামি শক্তি নীরবে সংগঠিত হয়েছে। ক্ষমতার স্বার্থে আওয়ামি-লিগ বিএনপি-সহ সব দলের হাত ধরে নানা কৌশলে তারা শক্তি সঞ্চয় করে। গত ১৫/১৬ বছর শেখ হাসিনার শাসনামলে জামায়াতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবির আওয়ামি লিগের ছাত্র লিগে অনুপ্রবেশ করে নিজেদের 'বঙ্গবন্ধুর সৈনিক'

পরিচয়ে করে কাজ করেছে। শেখ হাসিনার দলের নেতারা বুঝতে পারেননি, বুঝতে পারেনি প্রশাসনও। প্রশাসন বুঝতে পারেনি বললে কিছু ভুল হয়, প্রশাসনের জামায়াত বা উগ্রবাদী ইসলাম সমর্থক অংশ অত্যন্ত গোপনে এই উগ্র ইসলামি শক্তির হয়ে, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে পাকিস্তানের পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠিত হয়েছে। পাকিস্তান একাত্তরে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে গত পাঁচ দশক ধরে ছক সাজিয়েছে। কিছুই বুঝতে পারেনি আওয়ামি লিগ-সহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দলগুলো। প্রশাসনে থেকে যারা এই পরিকল্পনায় অত্যন্ত সুকৌশলে সহায়তা করেছে তারা শেখ হাসিনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এমনভাবে রক্ষা করে চলে এবং আস্থাভাজন হয় যে, কোনোভাবে বোঝার সাধ্যি ছিল না। এভাবে জামায়াত ও ইসলামি উগ্রবাদীরা কতটা শক্তিধর হয়েছে তারই প্রমাণ পাওয়া গেল ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে জেহাদি ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানে। বিশ্বমোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেখ হাসিনার উৎখাত চেয়েছিল, কারণ তিনি মার্কিনীদের চাওয়া পূরণ করতে পারছিলেন না। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে পাকিস্তানি পরিকল্পনা অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে তৈরি করা ছাত্র-জনতা রাজপথে নামে। আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার হাতে আসে অঢেল অস্ত্র ও অর্থ। এমন সব অস্ত্র আসে যা পুলিশের হাতেও ছিল না। বিএনপি ও অন্যান্য আওয়ামি লিগবিরোধী দলগুলো যখন বুঝতে পারে, সরকার পতনের দিকে এগুচ্ছে তারাও আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে এগিয়ে আসে। কারণ তাদের অনেকটা কোণঠাসা করে রেখেছিলেন শেখ হাসিনা। সেই ক্ষোভ জেহাদি আন্দোলনের শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

জেহাদি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর লক্ষ্য করা যায় মূলত মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামি লিগ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান, স্মারক এবং ব্যক্তিবর্গ হামলার শিকার হচ্ছেন। ভারতবিরোধী তৎপরতার পাশাপাশি নিশানায় থাকে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরাও। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ২৩ বছর ধরে জেহাদকে উসকে দেওয়া, বঙ্গের আবহমান সংস্কৃতিকে ভারতীয় আখ্যা দিয়ে ইসলামি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ভারতের বিরুদ্ধে বৈরিতা ও সেভেন সিস্টার্স-এর বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতাকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে মদদ দেওয়া, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নির্মূল করা এবং সংখ্যালঘুদের অত্যাচার-নির্যাতন করে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করাই ছিল পাকিস্তানি শাসকদের স্বপ্ন। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী শক্তির বিকাশ ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তাদের সে স্বপ্ন ভেঙে দেয়। উলটে পাকিস্তান পর্যুদস্ত হয়, একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চল পুরোটাই আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। এ পরাজয় ছিল অভূতপূর্ব। পাকিস্তান তা ভোলেনি কখনো। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পাশে ছিল, কিন্তু সপ্তম নৌবর পাঠিয়েও পাকিস্তানের পরাজয় ঠেকাতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্র সে অপমানও যে ভোলেনি, পরবর্তী সময়ে তা প্রমাণিত হয়েছে।

আশ্চর্য হচ্ছে, ২০২৪ সালের জেহাদি ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সরকারের পতন ও শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর দেখা গেল সেই আন্দোলনকারী ছাত্রগোষ্ঠী ও তাদের পছন্দে গঠিত ড. মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্যই দাঁড়ালো পাকিস্তানের অসম্পূর্ণ স্বপ্ন পূরণ করা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরাজিতদের প্রথম সাফল্য এসেছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করে। তখন শুধুমাত্র বেঁচে গিয়েছিলেন মুজিবের দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। তাঁরা তখন বিদেশে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিব পাকিস্তানে কারাগারে আটক ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মধ্যরাতে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার পর পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুজিবকে বন্দি করে ইসলামাবাদ নিয়ে যাওয়া হয়। দেশদ্রোহের অপরাধে সামরিক আদালতে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকার সারা বিশ্বে মুজিবের মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। সে আরেক কাহিনি।

এর পর দ্বিতীয় সাফল্য ছিল ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে মুক্তিযুদ্ধে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের চার নায়ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি ও মহম্মদ কামারুজ্জামানকে কারাগারে নৃশংসভাবে হত্যা। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় থিয়েটার রোডে বিপ্লবী সরকারের কার্যালয় স্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। মুজিব হত্যার পর এই চার নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। এই দুই হত্যাকাণ্ডই ঘটিয়েছিল সেনাবাহিনীর পাকিস্তানপন্থী একটি অংশ। পরে প্রমাণ পাওয়া গেছে, হত্যাকাণ্ডে পাকিস্তানের সরাসরি হাত ছিল।

এর পরের সাফল্য বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামিকে পুনর্বাসন ও ধীরে ধীরে ইসলামি জেহাদি শক্তির উত্থান ঘটানো। সব সরকারের আমলেই তারা শক্তি সঞ্চয় করেছে নানাভাবে। একটা উদাহরণই যথেষ্ট। একটি ইসলামি দল সবসময় 'আমরা হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগান' এই স্লোগান দিলেও আওয়ামি লিগ কিংবা বিএনপি কোনো সরকারের আমলেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আইএস (ইসলামিক স্টেট)-এর পতাকা হাতে মিছিল হলেও প্রসাসন কিংবা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে তৎপর হতে দেখা যায়নি।

আন্দোলনের ফসল ড. ইউনুসের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় পাকিস্তানের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা। অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে চোখে পড়ে, রাতারাতি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আন্তরিক হয়ে উঠলো, যা কয়েক দশক ধরে অনেকটা শীতল ছিল। পাকিস্তানের মন্ত্রীরা, সেনা কর্মকর্তারা, সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই কর্মকর্তারা দৌড়ঝাপ শুরু করলেন। বাণিজ্য জাহাজের সহস্যজনক আনাগোনা শুরু হলো। পাকিস্তানের স্রষ্টা জিন্নার জন্মবার্ষিকী পালন শুরু হলো,



পাকিস্তানি গায়করা ছুটে আসছেন ঢাকায়। মনে হয় দীর্ঘদিন পর পূর্ব ও পশ্চিম আবার ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে ফিরে এসেছে।

স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানের স্বপ্নের আরও কিছু অধরা অধ্যায় ছিল। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার সেই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবের বাড়ি, যেখান থেকে স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল, প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। ইউনুসের 'মব বাহিনী' সেই বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছেন। সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন ছবির মতো, সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। দেশ জুড়ে ভাঙা হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হাজার হাজার ভাস্কর্য। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তৎকালীন রেস কোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের ছবিটি ঐতিহাসিক। এই ছবিতে ভারতের জেনারেল অরোরা ও পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজিকে দেখা যায়, দলিলে স্বাক্ষর করছেন নিয়াজি। পাকিস্তানের পরাজয়ের এই স্মারক সারাদেশে দৃশ্যমান ছিল! ম্যুরাল ছিল অনেক। ইউনুসের 'মব বাহিনী' সবই ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন কোথাও চোখে পড়ে না। পরের প্রজন্ম যাতে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস অত্যাচার-নির্যাতন বা গণহত্যার কথা ভুলে যায়, পরাজয়ের কোনো চিহ্ন খুঁজে না পায় তার জন্য নোবেল শান্তি বিজয়ীর চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকছে না। পাকিস্তান খুশিতে আটখানা। পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল বলছে, বাংলাদেশ 'সেভেন সিস্টারস্' নিয়ে এগিয়ে গেলে পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানও আঘাত হানতে দ্বিধা করবে না। একেবারে দুই সীমান্তে যুদ্ধের হুমকি। এমন বন্ধুত্ব!

'ছায়ানট' ছিল সেই ষাটের দশক থেকে রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রগবেষণার অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। বাংলা গানের সব শাখায় ছিল তাদের পদচারণা। ধানমণ্ডিতে শেখ হাসিনার দেওয়া জায়গায় ভারতের আর্থিক সহায়কতায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল ছায়াটন ভবন। তিনি সভাপতি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের, সনজীদা খাতুন ষাটের দশকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম মুখ এবং 'ছায়ানট'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বছর খানেক আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তিনি ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৮ ডিসেম্বর মধ্যরাতে এই ছায়ানট ভবন লুটপাটের পর পুড়িয়ে দিয়েছে ইউনুসের 'মব বাহিনী'। যথানিয়মে সেনাসদস্য ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাণ্ডব দেখেছে। 'উদীচী' প্রতিষ্ঠা করেন বামধারার সাহিত্যিক সত্যেন সেন ও সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্ত। পরদিন 'উদীচী' কার্যালয়ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ করতে হয়, জামায়াতে ইসলামি-সহ আটটি ইসলামি দল দাবি জানিয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত ও চারুকলা শিক্ষক রাখা যাবে না। ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার এই দাবির বিরোধিতা করেনি। শেখ হাসিনা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত ও চারুকলা বিভাগের শিক্ষক পদ সৃষ্টি করে নিয়োগ করেছিল।

পাকিস্তানের পরাজয়ের সব চিহ্ন, বিশেষ করে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে মোল্লাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সেই সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব বাংলাদেশের মাটি থেকে মুছে দিতে নিরসলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন নোবেল শান্তি বিজয়ী ড. ইউনুস। 'ছায়ানট' ও 'উদীচী' নিশানায় ছিল আগেই। নির্বাচনের আগেই ইসলামি শরিয়ত প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকখানি এগিয়ে রাখতে চান তিনি। □



ঘনীভূত ভারতের প্রতিমূর্তি

স্বামী বিবেকানন্দ

রবিব্রত ঘোষ

নরেন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকেই এক সংশয়বাদী শিশু এবং পরবর্তীকালে শুরু হয় এক যুক্তিবাদী যুবকের পথ চলা। নিজের বাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে হুঁকো খেয়ে দেখা জাত কী করে যায়। স্কুলে ঋজু ব্যক্তিত্বের পরিচয়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। আর্তপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে সমস্যার সমাধান করা। যুবক বয়সে ভারতের মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী মানুষের কাছে যাতায়াত করা। প্রশ্ন ছিল, ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়?

ব্রাহ্মসমাজের বড়ো বড়ো ব্যক্তি থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সবাইকেই এই প্রশ্নটি করেছিলেন। কারোর কাছেই ঠিকমতো উত্তর পাননি। শেষমেশ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসা। মুখে মুখে তর্ক, পদে পদে পরীক্ষা করা। পরে নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়ে সারা জীবনের মতো শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু হিসেবে বরণ করা। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর, এক নতুন পথ খুঁজে বের করা। তার বছর কয়েক পরে মঠ ত্যাগ করে গোটা ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়ানো। কোথাও পায়ে হেঁটে, কোথাও রেলে বা কোথায় অন্য কোনোভাবে। দরিদ্রের পর্ণ কুটির থেকে রাজপ্রাসাদ, সর্বত্রই তার অবাধ গতি। তাঁর চরিত্রে, তার পাণ্ডিত্যে, বিস্ময়াভূত হয়ে বহু শিক্ষক, যুবক কাছে এসেছেন। এক নতুন ধরনের সন্ন্যাসী ভারতবর্ষকেই তিনি দেবী হিসেবে পূজা করেছিলেন। ভারতের দুঃখ দৈন্য, দুর্দশা, পরাধীনতা, জাতিভেদ সমস্ত কিছুই যাঁর শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেওয়া। আমেরিকা যাত্রা করা। হাড় হিম করা শীত সহ্য করা। তারপরেই এক আশ্চর্য কাণ্ড, একটি বক্তৃতা এবং বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করা। সেই তরঙ্গ যখন ভারতে এসে পৌঁছলো, ভারতবর্ষ জেগে উঠলো যে দীর্ঘদিনের ঘুমিয়ে একটা জাতি হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালো।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা বুঝিয়েছিল যে ভারতীয়রা অত্যন্ত অশিক্ষিত। প্রায় বর্বর বলা যায়, যাদের কোনো ইতিহাস নেই, যাদের কোনো ঐতিহ্য নেই, যাদের কোনো সংস্কৃতি নেই। এবং এটা আমরা বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম। সেই সময় অনেকেই চাইতেন ব্রিটিশ শাসন যেন ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন টিকে থাকে। তিনিই প্রথম আমাদের থেকে জানালেন এই দেশের অতীত ঐতিহ্যকে। পাশ্চাত্য বহির্জগতকে জয় করতে পারে কিন্তু অন্তর জগৎকে জয় করার সুলুক সন্ধান দিয়ে গেছে ভারত। পাশ্চাত্যের চোখ ধাঁধানো উন্নতি থাকতে পারে কিন্তু ভারতেরও রয়েছে জগৎ প্লাবনকারী ধর্ম। আসলে কেউই ছোটো নয় কেউই বড়ো নয়, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিপূরক। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়েই তিনি বললেন, খালি হাঁটু গেড়ে বসে থাকা নয়, দাতার ভূমিকাও বহন করতে হবে, জানতে হবে আমাদের কী কী দেওয়ার আছে গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে দিয়েই একটা জাতি বড়ো হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন যদি ইংরেজ বা মার্কিনদের সমকক্ষ হবার ইচ্ছে থাকে, তাহলে তোমাদের তাদের কাছে যেমন শিখতে হবে তেমনি তাদের শেখাতেও হবে। আর এখনও বহু শতাব্দী যাবৎ জগতকে তোমাদের শেখাবার বিষয় যথেষ্ট আছে। মাথা উঁচু করে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে তাঁর দীপ্ত ঘোষণা, চাই ওয়েস্টার্ন সায়েন্সের সঙ্গে বেদান্ত। স্বাধীনভাবে স্বদেশি বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর সায়েন্স পড়ানো। চিরকাল শিষ্য হয়ে থাকলেই চলবে না আমাদেরও গুরু হতে হবে। এই সহজ বিষয়টাই পাশ্চাত্যের প্রভাবিত তখনকার শিক্ষিত সমাজ বুঝতে পারেননি, যেটা স্বামীজী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ভারতের মর্ম কথাকে অন্তঃস্থ

করতে পেরেছিলেন এবং তাকে জগতের সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন।

ভারতের মহত্ত্ব তিনি খুব সুন্দরভাবে বুঝেছিলেন, তাই আমেরিকা থেকে ফেরত আসার সময় একজন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল এখন আপনি ভারতবর্ষকে কীভাবে দেখছেন? উত্তর দিয়েছিলেন দেশে থাকার সময় ভারতবর্ষ আমার কাছে মাতৃভূমি ছিল। এখন ভারতের ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র। ভারতের বাতাস আমার কাছে পবিত্র। ভারত আমার পুণ্যভূমি, ভারত আমার তীর্থস্থান। ভারত সম্বন্ধে এত ইতিবাচক ধারণা ভারতীয়দের ছিল না। যেমন ভারতের প্রাচীন সুমহান ঐতিহ্য সম্বন্ধে ভারতীয়রাই বিশ্বাস করতে পারতেন না। দেশে ফিরে এসে শুরু করলেন নতুন ধরনের ধর্ম সংস্কার। পূজাপাঠের মধ্যে দিয়ে নয়, মূল দেবতাকে খালি বিগ্রহের মধ্যে না রেখে তাকে গোটা জগতের মধ্যে দেখা। নিজের আশেপাশের দিন-দরিদ্র দুঃখী মানুষের মধ্যেও সেই ভগবানকে খুঁজে বার করা। ভারতবাসী নতুন ভাবে তাঁরা জেগে উঠলো। স্বামীজী বললেন তাদের ৩৩ কোটি দেবতা থাকতে পারে এখন পরাধীন জাতির কাছে সেসব দেবতার কোনো মূল্য নেই। তাদের কাছে এখন একটি ইষ্টদেবতা— দেশমাতৃকা। যার শৃঙ্খল মোচনই তাদের একমাত্র পূজা। একমাত্র ধ্যেয়।

নব্য যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করলেন স্বাধীন ভারতের জন্য আত্মনিবেদন করতে। কেউ অনুপ্রাণিত হলেন স্বামীজীর সেবা ধর্মে, কেউ পরাধীন ভারতবর্ষের দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করতে। কেউ হয়ে উঠলেন ক্ষুদিরাম কেউ হয়ে উঠলেন বাঘাযতীন, কেউ হয়ে উঠলেন সুভাষচন্দ্র বা কেউ হয়ে উঠলেন সেবাব্রতী সদানন্দ, শুভানন্দ।

সেই সময় ধীরে ধীরে জাতীয়তাবোধের ধারণাগুলি জেগে উঠছে, মূলত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। যাদের দাবি মূলত আরও বেশি সুযোগসুবিধা দাও। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের বার্তা পূর্ণ স্বাধীনতা ভিক্ষায় আবেদনের উপর নির্ভর করে নয়, চিন্তায় মননে চরিত্রে স্বাধীন হতে হয়।

অতি বড়ো আশাবাদী ও যখন স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখতে ভয় পাচ্ছেন ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন আগামী ৫০ বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। আগামী ৫০ বছর দেশমাতৃকাই তোমাদের উপাস্য দেবতা হোন। ভাবতে বড়ো আশ্চর্য লাগে, পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার প্রস্তাব নিতে কংগ্রেসের সময় লেগেছিল আরও ৩০ বছর। চিত্তরঞ্জন দাশের এর মতো দেশপ্রেমী মানুষকেও ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নাকি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়েছে উনিশশো কুড়ি-র দশকেও। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের পথ ঠিক তার বিপরীত, প্রবলতম আত্মসম্মান, প্রবলতম আত্মবিশ্বাস এবং দেশের প্রতি অসম্ভব ভালোবাসা।

দেশের প্রতিটি ভালো-মন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেওয়া। প্রতিটি কষ্টকে মর্মে মর্মে নিজের মধ্যে অনুভব করা। খুব সুন্দরভাবে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল এবং বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, বলছেন, বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়েছেন, আর রক্ষা করেছেন ভারতবর্ষকে। তিনি না এলে আমরা জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতাম। ফলে স্বাধীনতাও পেতাম না। খালি স্বাধীনতার আগমন বার্তা নয়, স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা দেওয়াই নয় এর বাইরে বিবেকানন্দের আরও একটি পরিচয় আছে, নতুন ধরনের এক পদ্ধতির কথা বলা। গোটা পথিবী ঘুরেছেন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র সমস্ত কিছুকেই দেখেছেন খুব কাছ থেকে। সেখান থেকে এটা বুঝে গিয়েছিলেন জনগণকে যদি যুক্ত না করা যায় তাহলে কোনো তন্ত্রই মানুষের কল্যাণে লাগবে না সেটা শেষমেশ শোষণতন্ত্রে পরিণত হবে। তাই ভারতে এসে বিবেকানন্দের নিদান ছিল, জনগণের দ্বারাই উন্নতি সাধন। এক আত্মনির্ভরশীল গোষ্ঠী তৈরি করা। খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন গোটা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ একটা গ্রামের উপরে ঢেলে দিলেও গ্রামটির উন্নতি করা যাবে না যদি না মানুষগুলি আত্মনির্ভরশীল হয়।

আর ভবিষ্যৎ ভারতের দিক নির্দেশ করা এর আগে পাশ্চাত্যের দেশগুলি মূলত সামরিক শক্তি বা ব্যবসায়িক শক্তির মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছিল। পৃথিবীতে যে স্থান করে নিতে পেরেছিল তার পিছনে মানুষের হৃদয়ের সমর্থন ছিল না। ছিল নিবিড় অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে তৈরি হওয়া এক বাধ্যতামূলক বশ্যতা। বিবেকানন্দই আমাদের স্বপ্ন দেখাবেন যে ভারতবর্ষ আবার উঠে এমনকী প্রাচীন ভারতের গৌরবকেও ছাপিয়ে যাবে। প্রশ্ন হলো কীভাবে উঠবে? বিবেকানন্দ বলছেন, ভারতবর্ষ আবার উঠবে, তবে সামরিক শক্তিতে নয়, প্রেম ও ভালোবাসা শক্তিতে, অর্থনৈতিক উন্নতির বৈশিষ্ট্য নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও মানবিক উৎকর্ষের বৈশিষ্ট্যে। ভবিষ্যৎ বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষকে কেন প্রয়োজন, গোটা বিশ্বের কাছে খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন। ভারতবর্ষে যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পৃথিবী থেকে প্রেম-ভালোবাসা মানবিকতার ধারণাগুলি বিনষ্ট হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণাটি। অন্যের মত ও পথকে সম্মান করার ইচ্ছাটি। বিভিন্নতা মেনেও সব মানুষকে ভালোবাসার আশ্চর্য ক্ষমতাটি।

তখনকার সময় এটাকে কথার কথা বলেই মনে হয়েছিল। এটা পালটে গেল দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর। দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর হত্যালীলা দেখে, এক মহান ঐতিহাসিকের মনে হয়েছিল এই আসন্ন ধ্বংস থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে বার করতেই হবে। তিনি তার নিজের ঐতিহাসিক বুদ্ধি থেকেই বুঝে নিয়েছিলেন না হলে মানুষের পরিণতি পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের মতো হবে। প্রাচীন গ্রিসের এথেন্স ও স্পার্টা শহর দু'টির মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধ একটা সময় থেমেও গিয়েছিল কারণ এক দল বিজয়ী হয়েছিল। একদল পরাজিত হয়েছিল। পরাজিত হয়েছিল মানবতা আর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল মহান গ্রিক সভ্যতা। মানব সভ্যতাকে বাঁচানোর উপায় হিসেবে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে। বিভিন্ন পথের মধ্যে একটা সমন্বয় করা বিভিন্নতা জেনেও আছে আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি করা। এটাই ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীর বাঁচার একমাত্র রাস্তা বলে তাঁর মনে হয়েছিল। যার মধ্যে দিয়ে স্বীকৃতি পেয়েছিল ভারতের সনাতন জীবনযাত্রা। ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ সভ্যতা সংস্কৃতি দৃষ্টিভঙ্গি। □



গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৫৫)

প্রথম 'সরসঙ্ঘচালক' প্রণাম

১৯২৯ সালের ১৯ অক্টোবর ডাক্তারজী নির্বাচিত কার্যকর্তাদের নিকট বিশেষ বৈঠক উদ্দেশ্যে একটি পত্র পাঠালেন। পত্রটি ছিল এরূপ— 'অদূর ভবিষ্যতে বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের তুফানের মধ্যে সঙ্ঘের নৌকা নিরাপদে কেমন করে চলবে, সঙ্ঘের নীতি কী হবে, তীব্রতর গতিতে সঙ্ঘের বৃদ্ধির জন্য কীরকম যোজনা গ্রহণ করতে হবে, এই ধরনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিবেচনা করার জন্য ৯ ও ১০ নভেম্বর সমস্ত সঙ্ঘচালকদের সভা নাগপুরে করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই সভায় আপনি দু-একজন প্রমুখ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। সঙ্ঘের সঙ্গে যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার দরুন বিচার বিনিময়ের ব্যাপারে যারা কাজে লাগবেন। অবশ্যই আসবেন।

সমস্ত কার্যকর্তা ডাক্তারজীর এই আহ্বানের গুরুত্ব ও মর্মার্থ নিবিড়ভাবে অনুভব করলেন এবং পরিকল্পনা মত ৯ ও ১০ নভেম্বর ডোকে মহারাজের মঠে সঙ্ঘচালক ও কার্যকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সকলের আলোচনায় স্থির হয় সঙ্ঘ এক চালকানুবর্তী (এক প্রধান) পরিকাঠামোর ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। পরের দিন বিকালে মোহিতে সঙ্ঘস্থানে বৈঠকের কার্যকর্তাবৃন্দ-সহ নগরের সমস্ত স্বয়ংসেবকদের সম্মেলন শাখা আয়োজিত হয়। এক সময় সঙ্ঘস্থানের পেছনে সঙ্ঘচালক ও কার্যকর্তারা যখন সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ডাক্তারজী ধ্বজের কাছে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। তখন বৈঠকের সিদ্ধান্তকে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, আপ্পাজী যোশী যা তিনি পূর্বেই সকলকে সূচনা দিয়ে রেখেছিলেন, বেশ জোরালো কণ্ঠে আজ্ঞা দিলেন— 'সরসঙ্ঘচালক প্রণাম ১,২,৩'।

সমবেত সকল স্বয়ংসেবক সরসঙ্ঘচালক ডাক্তার কেশবরাও হেডগেওয়ারকে প্রণাম করলো। এরপরে এক নেতৃত্ব অনুগামিতা বিষয়ে শ্রী বিশ্বনাথরাও কেলকর ওজস্বী ভাষণ প্রদান করেন। ডাক্তারজী এভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত হওয়ায় একটু মনক্ষুণ্ণ হলেন এবং শাখা শেষে আপ্পাজীকে বললেন— 'আপ্পাজী, আজ আপনি আগে থেকে নিশ্চিত না করা যে কাজ করলেন তা আমার পছন্দ হয়নি। কারণ আমার থেকে জ্যেষ্ঠ তথা সম্মাননীয় সহকর্মীদের প্রণাম আমি গ্রহণ করলাম, এটা ঠিক হয়নি'।

খুব সুন্দর ছিল আপ্পাজীর উত্তরও— 'কাজের সুবিধার জন্য আমরা সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাকে অপ্রসন্ন করার মতো এই কাজ করেছি'। সৌভাগ্যবশত এ বিষয়ে ডাক্তারজীর মনের কথা পরবর্তীতে (১৯৩৩) লিখিত ভাবে পাওয়া যায়। যার কথাগুলি ছিল এরকম—

১. 'এই সঙ্ঘের জন্মদাতা বা প্রতিষ্ঠাতা আমি নয়, আপনারা সবাই। এ বিষয়ে আমার পূর্ণ ধারণা আছে।

২. আপনাদের দ্বারা সৃষ্ট সঙ্ঘের, আপনাদের ইচ্ছা ও আজ্ঞায় আমি ধাত্রীর কাজ করছি।

৩. এরপরেও যতদিন আপনাদের ইচ্ছা ও আজ্ঞা হবে, ততদিন এই কাজ আমি করে যাব এবং এই কাজ করার সময় যতই সংকট আসুক এবং মান-অপমান সহ্য করার প্রসঙ্গ আসুক, আমি কখনো পিছু হটবো না।

৪. কিন্তু আমার এই কাজের যোগ্যতা না থাকায় আমার দ্বারা সঙ্ঘের ক্ষতি হচ্ছে বলে যদি আপনাদের মনে হয়, তাহলে যোগ্য মানুষকে এই পদের জন্য খুঁজে নেবেন।

৫. আপনাদের আদেশে যত আনন্দের সঙ্গে এই পদ গ্রহণ করেছি, ততটাই আনন্দের সহিত আপনাদের দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তির হাতে সমস্ত অধিকার সমর্পণ করে সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর আজ্ঞাবহ স্বয়ংসেবক হিসেবে চলবো'। (সংক্ষেপিত)

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস